ফাতেমা খালা একটা চিরকুট পাঠিয়েছেন। চিরকুটে লেখা—

হিমু,

এক্ষুনি চলে আয়, ম্যানেজারকে পাঠালাম। খবর্দার দেরি করবি না।

খুবই জরুরী। Very urgent.

ইতি

ফাতেমা খালা।

ম্যানেজার ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে বসে আছেন। তার গায়ে স্যুট। পায়ে কালো রঙের জুতা। মনে হয় আসার আগে পালিশ করিয়ে এনেছেন। জুতা জোড়া আয়নার মত চকচক করছে। গলায় সবুজ রঙের টাই। বেশির ভাগ মানুষকেই টাই মানায় না। ইনাকে মানিয়েছে। মনে হচ্ছে ইনার গলাটা তৈরিই হয়েছে টাই পরার জন্যে। ভদ্রলোক আফটার শেভ লোশন, কিংবা সেন্ট মেখেছেন। মিষ্টি গন্ধ আসছে। তার চেহারাও সুন্দর। ভরাট মুখ। ঝকঝকে শাদা দাঁত। বিদেশী টুথপেষ্টের বিজ্ঞাপনে এই দাঁত ব্যবহার করা যেতে পারে। ভদ্রলোককে ফাতেমা খালার ম্যানেজার বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে কোন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট। বোঝাই যাচ্ছে, আমার ঘরটা তাঁর খুবই অপছন্দ হচ্ছে। তিনি সম্ভবত কোন বিকট দুর্গন্ধ পাচ্ছেন। কারণ কিছুক্ষণ পরপরই চোখ-মুখ কুঁচকে ফেলে নিঃশ্বাস টানছেন। পকেটে হাত দিচ্ছেন, সম্ভবত রুমালের খোঁজে। তবে ভদ্রতার খাতিরে রুমাল দিয়ে নাকচাপা দিচ্ছেন না। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন। সম্ভবত দুর্গন্ধ কোত্থেকে আসছে তা বের করার চেষ্টা।

ভদ্রলোক অস্থির গলায় বললেন, 'বসে আছেন কেন? চলুন, দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, 'কোথায় চলব?'

ভদ্রলোক অতিরিক্ত রকমের বিস্মিত হয়ে বললেন, 'আপনার খালার বাসায়। আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি।'

'দেরি হবে। হাত-মুখ ধোব, চা-নাশতা করব।'

'চা-নাশতা ম্যাডামের বাসায় করবেন। চট করে মুখটা শুধু ধুয়ে নিন।'

'মুখ ধুতেও দেরি হবে। ঘন্টা দুই লাগবে।'

ভদ্রলোক আকাশ থেকে পড়ার মত করে বললেন, 'মুখ ধুতে দু'ঘন্টা লাগবে?'

আমি আবারো হাই তুলতে তুলতে (এবারের হাইটা নকল হাই) বললাম, 'বেশিও লাগতে পারে। আমাদের এই মেসে একটা মোটে বাথরুম। ত্রিশজন বোর্ডার। ত্রিশজন বোর্ডারের সঙ্গে সব সময় থাকে গোটা দশেক আত্মীয়, কিছু দেশের বাড়ির মানুষ। সব মিলিয়ে গড়ে চল্লিশজন। এই চল্লিশজনের সঙ্গে আমাকে লাইনে দাঁড়াতে হবে। সকালবেলার দিকে লম্বা লাইন হয়।'

'দু'ঘন্টা অপেক্ষা করা সম্ভব না। আপনি গাড়িতে উঠুন। হাত-মুখ আপনার খালার বাড়িতে ধুবেন। সেখানকার ব্যবস্থা অনেক ভাল।'

ভদ্রলোকের গলায় এখন হুকুমের সুর বের হচ্ছে। স্যুট-টাই পরা মানুষ অবশ্যি নরম স্বরে কথা বলতে পারে না। আপনাতেই তাদের গলার স্বরে একটা ধমকের ভাব চলে আসে। অবশ্যি স্যুট পরা মানুষ মিনমিন করে কথা বললে শুনতেও ভাল লাগে না। তাদেরকে ঘরজামাই মনে হয়। শ্বশুরবাড়ির স্যুটে পার্সোনিলিটি আসে না।

'একি এখনো বসে আছেন? বললাম না, চলুন।'

আমি চৌকি থেকে নামতে নামতে বললাম, 'আজ কি বার?'

'মঙ্গলবার।'

আমি আবারো ধপ করে চৌকিতে বসে পড়লাম। চিন্তিত ভঙ্গিতে বললাম, 'মঙ্গলবার যদি হয়, তাহলে যাওয়া যাবে না। মঙ্গলবার যাত্রা নাস্তি।'

'যাবেন না?'

'জ্বি না। আপনি বরং বুধবারে আসুন।'

'বুধবারে আসব?'

'জ্বি। খনার বচনে আছে — বুধের ঘাড়ে দিয়ে পা, যথা ইচ্ছা তথা যা।'

ম্যানেজার চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছেন। মনে হচ্ছে খনার বচন শোনা তাঁর অভ্যাস নেই। তিনি মনে হয় খানিকটা রেগেও যাচ্ছেন। চোখ ছোট ছোট হয়ে গেছে। রাগলে মানুষের চোখ ছোট হয়ে যায়। আনন্দিত মানুষের চোখ হয় বড় বড়।

'হিমু সাহেব।'

'জ্বি।'

'আপনাকে যেতেই হবে। ম্যাডাম আমাকে পাঠিয়েছেন, আপনাকে নিয়ে যেতে। আমি না নিয়ে যাব না। আপনি লাইনে দাঁড়িয়ে হাত-মুখ ধোন, চা-নাশতা খান, ইচ্ছে করলে আরো খানিকক্ষণ গড়াগড়ি করুন। আমি বসছি। দু'ঘন্টা কেন, দরকার হলে সাত ঘন্টা বসে থাকব। কিছু মনে করবেন না, নাশতা কি নিজেই বানাবেন?'

'জ্বি না। ছক্কু দিয়ে যাবে।'

'ছক্কুটা কে?'

'বিসমিল্লাহ রেস্টুরেন্টের বয়।'

'ছক্কু নাশতা কখন দিয়ে যাবে?'

'হাত-মুখ ধুয়ে এসে উত্তর দিকের এই জানালাটা খুলে দেব। এটাই হল আমার সিগন্যাল। বিসমিল্লাহ রেস্টুরেন্ট থেকে আমার ঘরের জানালা দেখা যায়। ছক্কু আমার ঘরের জানালা খোলা দেখে বুঝবে আমি হাত-মুখ ধুয়ে ফেলেছি। সে নাশতা নিয়ে চলে আসবে। পরোটা-ভাজি।'

'কিছু মনে করবেন না, আমি এখনই জানালাটা খুলে দি। আপনার হয়ে সিগন্যাল দিয়ে দি। নাশতা চলে আসুক। নয়ত নাশতার জন্যে আবার এক ঘন্টা বসতে হবে।'

'আগেভাগে জানালা খোলা ঠিক হবে না। আমার ঘরটা নর্দমার পাশে তো— বিকট গন্ধ আসবে। আপনি নতুন মানুষ। আপনার অসুবিধা হবে। শুধু রুমালে কাজ হবে না। গ্যাস মাস্ক পরতে হবে।'

ভদ্রলোক বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। কিছু কিছু মানুষ আছে — সহজে বিস্মিত হয় না। তারা যখন বিস্মিত হয় তখন দেখতে ভাল লাগে। এই ভদ্রলোক মনে হচ্ছে সেই দলের। তার বিস্মিত দৃষ্টি দেখতে ভাল লাগছে। তাকে আরো খানিকটা ভড়কে দিলে কেমন হয়?

'ম্যানেজার সাহেব! আপনার নাম কি?'

'রকিব! রকিবুল ইসলাম।'

'আপনি ভাল আছেন?'

রকিবুল ইসলাম জবাব দিলেন না। সরু চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি বোধহয় তাঁর শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে চান না।

'ফাতেমা খালার ম্যানেজারী কতদিন হল করছেন?'

'বেশিদিন না, দু'মাস।'

'খালার অবস্থা কি? তার মাথা কি পুরোপুরি আউলা হয়ে গেছে— না এখনো কিছু বাকি আছে?'

'কি বলছেন আপনি, মাথা আউলা হবে কেন?'

'গুপ্তধন পেলে মানুষের মাথা আউলা হয়। খালা গুপ্তধন পেয়েছেন। গুপ্তধন এখনো আছে, না খরচ করে ফেলেছেন?'

ম্যানেজার গম্ভীর ভঙ্গিতে বললেন, ম্যাডাম সম্পর্কে আপনার সঙ্গে কোন আলোচনায় যেতে চাচ্ছি না। উনি আপনার খালা। উনার সম্পর্কে আপনি যা ইচ্ছা বলতে পারেন। আমি পারি না। আমি তার এমপ্লয়ী। আমার অনেক দায়িত্বের একটি হল তার সম্মান রক্ষা করা। হিমু সাহেব, আপনি অপ্রয়োজনীয় কথা বলে সময় নষ্ট করছেন। আপনি বরং দয়া করে বাথরুমের লাইনে দাঁড়ান। উত্তরের জানালা খোলার দরকার নেই। আমি বিস্‌মিল্লাহ রেষ্টুরেন্টে গিয়ে ছক্কুকে নাশতা দিতে বলে আসছি।

'ধন্যবাদ!'

'আর আপনি যদি চান, আমি আপনার হয়ে লাইনেও দাঁড়াতে পারি।

'এই বুদ্ধিটা খারাপ না। আপনি বরং লাইনে দাঁড়ান। আমি চট করে রেষ্টুরেন্ট থেকে এক কাপ চা খেয়ে আসি। কোষ্ঠ পরিষ্কারের জন্যে খালি পেটে চায়ের কোন তুলনা নেই। কড়া এক কাপ চা। চায়ের সঙ্গে একটা আজিজ বিড়ি। ডাইরেক্ট একশান। কোষ্ঠের জগতে তোলপাড়। কোষ্ঠ মানে কি জানেন তো? কোষ্ঠ মানে হচ্ছে গু। কোষ্ঠ কাঠিন্য মানে কঠিন গু।'

রকিবুল ইসলাম আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। এরকম কঠিন চোখে অনেক দিন কেউ আমার দিকে তাকায়নি।

দোতলায় নেমে এলাম। মেসের কেয়ার টেকার হাবীব সাহেব (আড়ালে ডাকা হয় হাবা সাহেব। যদিও তিনি মোটেই হাবা না। চালাকের চূড়ান্ত। সুগার কুটেট কুইনাইনের মত হাবা কোটেট বুদ্ধিমান)। বললেন, 'হিমু ভাই, আজকের কাগজ পড়েছেন?'

আমি বললাম, 'না।'

'ভয়াবহ ব্যাপার। আবার একটা ন' বছরের মেয়ে রেপড হয়েছে। একটু দাঁড়ান, পড়ে শোনাই।'

'এখন শুনতে পারব না। আপনি ভাল করে পড়ে রাখুন — পরে শুনে নেব।'

'মেয়েটার নাম মিতু। যাত্রাবাড়িতে বাসা। বাবা রিকশা চালায়।'

'ও আচ্ছা।'



'আমি একটা ফাইলের মত করছি। সব রেপের নিউজ কাটিং জমা করে রাখছি।'

'ভাল করছেন।'

হাবা সাহেবের হাত থেকে সহজে উদ্ধার পাওয়া যায় না। ভাগ্য ভাল তাঁর হাত থেকে আজ সহজেই ছাড়া পাওয়া গেল। ভাগ্য একবার ভাল হওয়া শুরু হলে ভালটা চলতেই থাকে। অতি সহজে বাথরুমেও ঢুকে পড়তে পারলাম। মনের আনন্দে দু' লাইন গানও গাইলাম —

"জীবনের পরম লগ্ন করো না হেলা
হে গরবিনী।"

রবীন্দ্রনাথ কি কোনদিন ভেবেছিলেন তার গান সবচে বেশি গীত হবে বাথরুমে! এমন কোন বাঙালি কি আছে যে বাথরুমে ঢুকে দু' লাইন গুণগুণ করেনি!

বাথরুমকে ছোট করে দেখার কিছু নেই। জগতের মহত্তম চিন্তাগুলি করা হয় বাথরুমে। আমি অবশ্যি এই মুহূর্তে তেমন কোন মহৎ চিন্তা করছি না। ফাতেমা খালার কথা ভাবছি— হঠাৎ খোঁজ করছেন, ব্যাপারটা কি?

ফাতেমা খালার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তিনি বেশ সহজ স্বাভাবিক মহিলাই ছিলেন। জর্দা দিয়ে পান খেতেন। আগ্রহ নিয়ে টিভির নাটক, ছায়াছন্দ এবং বাংলা সিনেমা দেখতেন। ম্যাগাজিন পড়তেন (তাঁর ম্যাগাজিন পড়া বেশ অদ্ভুত। মাঝখানের পৃষ্ঠা খুলবেন। সেখান থেকে পড়া শুরু হবে)। খালা দু'টা ভিডিও ক্লাবের মেম্বার ছিলেন। ক্লাব থেকে লেটেস্ট সব হিন্দী ছবি নিয়ে আসতেন। তাঁর ঘরের দু'জন কাজের মেয়েকে নিয়ে রাত জেগে হিন্দী ছবি দেখতেন। কঠিন কঠিন হিন্দী ডায়ালগ ওদের বুঝিয়ে দিতেন। অমিতাভ বচ্চন কেন দিলীপ কুমারের চেয়ে বড় অভিনেতা— এই ধরনের উচ্চতর গবেষণা ওদের নিয়ে করতেন এবং ওদের মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন।

তাঁর একটা অটোগ্রাফের খাতাও ছিল। বাইরে বেরুলেই সেই খাতা তাঁর সঙ্গে থাকত। যে কোন সময় বিখ্যাত কোন ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। খাতা সঙ্গে না থাকলে সমস্যা। নিউ মার্কেটে একদিন রুটি কিনতে গিয়ে আসাদুজ্জামান নূর সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি ফাতেমা খালাকে অটোগ্রাফ দিলেন —

জয় হোক
আসাদুজ্জামান নূর।

আরেকবার এলিফ্যান্ট রোডে দেখা হল চিত্রনায়িকা মৌসুমীর সঙ্গে। মৌসুমী ম্যাডাম বোরকা পরে ছিলেন। তারপরেও ফাতেমা খালা তাকে চিনে ফেললেন। মৌসুমী ম্যাডামও অটোগ্রাফ দিয়েছেন —

মানুষ হও

মৌসুমী।

খালার জীবন মোটামুটি সুখেই কেটে যাচ্ছিল। সমস্যা বাধালেন খালু সাহেব। তিনি ফট করে একদিন মরে গেলেন।

ফাতেমা খালার জীবনধারায় বিরাট পরিবর্তন হল। তিনি পুরোপুরি দিশাহারা হয়ে গেলেন। খালাকে দোষ দেয়া যায় না। যে কোন মানুষই দিশাহারা হত। কারণ ছোট খালুর মৃত্যুর পর দেখা গেল এই ভদ্রলোক কয়েক কোটি টাকা নানানভাবে রেখে গেছেন। ফাতেমা খালার মত ভয়াবহ খরুচে মহিলার পক্ষেও এক জীবনে এত টাকা খরচ করার কোন উপায় নেই।

ছোট খালু মোহাম্মদ শফিকুল আমিন বিচিত্র মানুষ ছিলেন। ভদ্রলোককে দেখেই মনে হত মাথা নিচু করে বসে থাকা ছাড়া তিনি কোন কাজ করেন না। বসে থাকা ছাড়া তিনি আর যা করেন তা হচ্ছে গায়ের চাদর দিয়ে চশমার কাচ পরিষ্কার। শীত এবং গ্রীষ্ম দুই সিজনেই তিনি গায়ে চাদর পরতেন সম্ভবত চশমার কাচ পরিষ্কারে সুবিধার জন্যে। মোহাম্মদ মুকাদ্দেস মিয়াকে দেখে কে বলবে তার নানান দিকে নানান ব্যবসা — ব্রিক ফিল্ড, স্পিনিং মিলের শেয়ার, এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট, গারমেন্টসের ব্যবসা, ট্রান্সপোর্ট ব্যবসা।

ব্যবসায়ী মানুষ মাত্রই উদ্বেগের ভেতর বাস করে। ঘুমের অষুধ খেয়ে রাতে ঘুমায়। পীর-ফকিরের কাছে যাতায়াত করে। হাতে রংবেরং-এর পাথরওয়ালা আংটি পরে। অল্প বয়েসেই তাদের ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, হাই ব্লাড প্রেসার হয়। সবচে বেশি যা হয় তার নাম গ্যাস। ব্যবসায়ী মাত্রেরই পেট ভর্তি থাকে গ্যাস। মাঝারি টাইপের যে কোন ব্যবসায়ীর পেটের গ্যাস দিয়ে দুই বার্নারের একটা গ্যাস চুলা অনায়াসে কয়েক ঘন্টা জ্বালানো যায়। একমাত্র ছোট খালুকে দেখলাম গ্যাস ছাড়া। পেটে গ্যাস নেই, ব্যবসা নিয়ে কোন উদ্বেগও নেই। তাকে বেশির ভাগ সময়ই দেখেছি জবুথবু হয়ে বসে থাকতে। আগবাড়িয়ে কারো সঙ্গে কথাও বলতেন না। তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা এক বিয়েবাড়িতে। বিয়েবাড়ির হৈচৈ-এর মধ্যে তিনি এক কোণায় সোফায় পা উঠিয়ে বসে আছেন। মনে হল তার শীত করছে, কেমন গুটিসুটি মেরে বসা। আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'খালু সাহেব কেমন আছেন?'

তিনি নিচু গলায় বললেন, 'ভাল।'

'খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?'

হুঁ।'

'তাহলে শুধু শুধু বসে আছেন কেন, চলে যান।'

'তোমার খালার জন্যে বসে আছি। একটু দেখবে — ও যাবে কিনা। মনে হয় না বিয়েবাড়ির মজা ফেলে যাবে।'

আমি খালাকে খুঁজে বের করলাম। তিনি হতভম্ব গলায় বললেন, 'পাগল! আমি এখনি যাব কি? খাওয়া-দাওয়ার পর গান-বাজনা হবে। গান শুনব না? তুই তোর খালুকে চলে যেতে বল। গাড়িটা যেন রেখে যায়। হিমু শোন, তুই একটা উপকার করবি? তোর খালুর সঙ্গে বাসায় চলে যা। আমার অটোগ্রাফের খাতাটা নিয়ে আয়।'

'খাতা ফেলে এসেছ?'

'হুঁ। মাঝে মাঝে এমন বোকামি করি যে ইচ্ছা করে নিজেকেই নিজে চড় মারি। চড় মেরে চাপার দাঁত ফেলে দেই।'

'বিয়েবাড়িতে বিখ্যাত কেউ এসেছে?'

'তুই কি গাধা নাকি? দেখতে পাচ্ছিস না — জুয়েল আইচ সাহেব এসেছেন, উনার স্ত্রী বিপাশা আইচ এসেছেন। এরা কতক্ষণ থাকবেন কে জানে। তুই চট করে অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে আয়। আমার ড্রেসিং টেবিলের উপর আছে। শুধু খাতা না, কলমও আনবি।'

আমি খালু সাহেবের সঙ্গে বাসায় গেলাম। ড্রেসিং টেবিলের উপর থেকে ফাতেমা খালার অটোগ্রাফের খাতা উদ্ধার করলাম। খালু সাহেব গুণে গুণে সাত টাকা দিয়ে দিলেন ফেরার রিকশা ভাড়া। আমাকে বললেন, রিকশাওয়ালা আট টাকা চাইবে। দরাদরি করলে সাত টাকায় রাজি হবে।

আমি কিছুক্ষণ বিস্মিত হয়ে খালুর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আচ্ছা।' পরদিন খালু সাহেবকে আমি চার টাকা ফেরত দিয়ে বললাম, 'শেয়ারে রিকশা পেয়ে চলে গেছি। তিন টাকা নিয়েছে। আপনার চার টাকা বাঁচিয়ে দিলাম।'

তিনি হাসতে হাসতে বললেন, 'ঐদিন গুণে গুণে সাত টাকা দিয়েছি বলে রাগ করেছ?'

আমি বললাম, 'না, রাগ করব কেন?'

'মনে হয় রাগ করেছ। রাগ না করলে এই চার টাকা ফেরত দিতে আসতে না। যাই হোক, তুমি কিছু মনে করো না। হিসেব করে করে এই অবস্থা হয়েছে। সারাক্ষণ হিসেব করি। গাড়িতে যখন তেল ভরি তখন হিসেব করি কতটুকু তেল

নিলাম। গাড়ি কতক্ষণ চলবে। এর আগে কবে তেল নিয়েছি। বুঝলে হিমু, আমি শান্তিমত পাঁচটা টাকাও খরচ করতে পারি না। ঐদিন কি হয়েছে শোন — গাড়ি করে যাচ্ছি মতিঝিল। শেরাটনের কাছে রেড লাইটে গাড়ি থেমেছে — ফুল বিক্রি করে একটা মেয়ে এসে ঘ্যানঘ্যান শুরু করল, ফুল নেন। ফুল নেন। আমি মুখ শক্ত করে বসে আছি। হঠাৎ দেখি আমার ড্রাইভার তার পকেট থেকে ফস করে একটা দশ টাকার নোট বের করে মেয়েটাকে দিয়ে দিল। আমি হতভম্ব।'

'ড্রাইভারের কাণ্ড দেখে খুশি হলেন?'

'না। আমার মাথায় ঢুকে গেল, ড্রাইভার কি পয়সা মারছে? তেল চুরি করছে? নতুন টায়ার বিক্রি করে পুরান টায়ার লাগিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে? তা না করলে ফুলওয়ালীকে ফস করে দশ টাকার নোট দেয় কি করে?'

'আপনি ড্রাইভার ছাঁটাই করে দিলেন?'

'ঠিক ধরেছ। নতুন ড্রাইভার নিলাম। আমি অবশ্যি এম্নিতেই এক ড্রাইভার বেশিদিন রাখি না। চার মাসের বেশি কাউকেই রাখি না। ড্রাইভাররা শুরুতেই চুরি শুরু করে না। একটু সময় নেয়। আমি সেই সময় পর্যন্ত তাদের রাখি। তারপর বিদায়। সবই হচ্ছে আমার হিসেব। আমি বাস করি কঠিন হিসেবের জগতে।'

'তার জন্যে কি আপনার মন খারাপ হয়?'

'না, মন খারাপ হয় না। আমাকে তৈরিই করা হয়েছে এইভাবে — মন খারাপ হবে কেন? সাধু সন্ত মানুষ কি মন খারাপ করে — কেন তারা সাধু প্রকৃতির হল? না করে না। কারণ তাদের মানসিক গড়নটাই এমন। আমার বেলাতেও তাই। এই যে তুমি হিমু সেজে পথে পথে ঘুরে বেড়াও — তোমার কি মন খারাপ হয়?'

'না।'

'কফি খাবে?'

'কফিও নিশ্চয়ই আপনার হিসেব করা। আমি খেলে কম পড়বে না?'

'না, কম পড়বে না, খাও। কফি খেতে খেতে তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করি।'

ছোট খালু নিজেই কফি বানালেন। টিনের কৌটা খুলে বিসকিট বের করলেন। কেক বের করলেন। অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বললেন, 'আলসারের মত হয়েছে। ডাক্তার শুধু চা কিংবা কফি খেতে নিষেধ করেছে। গরু ছাগলের মত সারাক্ষণই কিছু খাই।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'নিজের জন্যে এক্সট্রা খরচ করতে হচ্ছে — এই জন্যে মনটা সব সময় খচখচ করে?'

খালু সাহেব লজ্জিত মুখে বললেন, 'হ্যাঁ, করে।'

'আচ্ছা খালু সাহেব, আপনার ঠিক কত টাকা আছে বলুন তো?'

'তেমনভাবে হিসেব করিনি। ভালই আছে।'

'ভালই মানে কি?'

'বেশ ভাল।'

'কোটির উপর হবে?'

'তা তো হবেই।'

একটা মানুষের কোটির উপর টাকা আছে, 'সে নির্বিকার ভঙ্গিতে কফি বানাচ্ছে ভেবেই আমার শীত শীত করতে লাগল। অবশ্যি আজ এম্নিতেই শীত। কোল্ড ওয়েভ। শীতটা টের পাচ্ছিলাম না। এখন পাচ্ছি।

'খালু সাহেব চলুন একটা কাজ করি। এক রাতে আমরা দু'টা ফিফটিন সিটার মাইক্রোবাস ভাড়া করি। বাস ভরতি থাকবে কম্বল। শীতের রাতে আমরা শহরে ঘুরব— যেখানেই দেখব খালি গায়ে লোকজন শুয়ে আছে— ওম্নি দূর থেকে তাদের গায়ে একটা কম্বল ছুঁড়ে দিয়েই লাফ দিয়ে মাইক্রোবাসে উঠে পালিয়ে যাব। যাকে কম্বল দেয়া হয়েছে সে যেন ধন্যবাদ দেয়ার সুযোগও না পায়।'

'কাজটা কি জন্যে করব, সোয়াবের জন্যে? বেহেশতে যাতে হুরপরী পাই?'

'না সোয়াব-টোয়াব না, হঠাৎ দামী কম্বল পেয়ে লোকগুলির মুখের ভাব দেখে মজা পাওয়া। আপনার জীবনে নিশ্চয়ই মজার অংশ খুব কম। যাদের জীবনে মজার অংশ কম তারা অন্যদের মজা দেখে আনন্দ পায়। দুধের স্বাদ ভাতের মাড়ে মেটানোর মত।'

খালু সাহেব সিগারেট ধরালেন। শান্ত মুখে সিগারেট টান দিচ্ছেন, কিছু বলছেন না। আমি কফি শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম। ছোট খালু আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে। বাস ভর্তি কম্বল দেয়া যাক। কবে দিতে চাও?'

'পুরোটাই তো আপনার উপর। আপনি যে রাতে ঠিক করবেন, সেই রাতেই যাব। চলুন আজই যাই।'

'আজ না, তুমি আগামী সোমবারে এসো। রাত ন'টার দিকে চলে এসো। এক সঙ্গে রাতের খাবার খেয়ে বের হয়ে পড়ব। রাত বারোটার দিকে বের হব।'

'ঠিক আছে।'

'আমি কম্বল কিনিয়ে রাখব। হাজার পাঁচেক কম্বল কিনলে হবে না?'

'অবশ্যই হবে। কম্বল দিয়ে একবার যদি মজা পেয়ে যান তাহলে আপনি কম্বল দিতেই থাকবেন। কে জানে আপনার নামই হয়ত হয়ে যাবে শফিকুল আমিন কম্বল।'

খালু সাহেব আমার রসিকতা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে নিচুগলায় বললেন, 'কম্বল দেয়া যেতে পারে। আমার যে মাঝে মাঝে দিতে ইচ্ছা করে না, তা না। কেন জানি শেষ পর্যন্ত দেয়া হয় না।'

সোমবার রাত বারোটায় তাঁর কম্বল নিয়ে বেরুবার কথা, উনি মারা গেলেন শনিবার সকাল দশটায়। অফিসে যাবার জন্যে কাপড় পরেছেন, ফাতেমা খালাকে বললেন, 'একটা স্যুয়েটার দাও তো। ভাল ঠাণ্ডা লাগছে, শুধু চাদরে শীত মানছে না।'

খালা রান্নাঘরে রান্না করছিলেন। তিনি বললেন, 'আমার হাত বন্ধ, তুমি নিজে খুঁজে নাও। আলমিরায় আছে। নিচের তাকে দেখ।'

খালু সাহেব নিজেই স্যুয়েটার খুঁজে বের করলেন। স্যুয়েটার পরলেন না। হাতে নিয়ে খাবার ঘরে বসে রইলেন। ফাতেমা খালা রান্নাঘর থেকে বের হয়ে অবাক হয়ে বললেন, 'কি ব্যাপার, তুমি অফিসে যাওনি?'

'শরীরটা ভাল লাগছে না। দেখি এক কাপ লেবু চা দাও তো।'

'স্যুয়েটার হাতে নিয়ে বসে আছ কেন?'

'পরতে ইচ্ছা করছে না। আঁস ফাঁস লাগছে।'

ফাতেমা খালা আদা চা বানিয়ে এসে দেখেন খালু সাহেব কাত হয়ে চেয়ারে পরে আছেন। ক্রীম কালারের স্যুয়েটারটা তার পায়ের কাছে পরে আছে। প্রথম দেখায় তার মনে হল— মানুষটা বুঝি ক্লান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে।

আমি সকাল বেলাতেই খবর পেলাম — ঠিক করলাম একটু রাত করে খালাকে দেখতে যাব। সন্ধ্যার মধ্যে চিৎকার, কান্নাকাটি থেমে যাওয়ার কথা। যে বাড়িতে মানুষ মারা যায় সে বাড়িতে মৃত্যুর আট থেকে ন' ঘন্টা পর একটা শান্তি শান্তি ভাব চলে আসে। আত্মীয়-স্বজনরা কান্নাকাটি করে চোখের পানির স্টক ফুরিয়ে ফেলে। চেষ্টা করেও তখন কান্না আসে না। তবে বাড়ির সবার মধ্যে দুঃখী দুঃখী ভাব থাকে। সবাই সচেতনভাবেই হোক বা অবচেতনভাবেই হোক — দেখাবার চেষ্টা করে মৃত্যুতে সে-ই সবচে বেশি কষ্ট পেয়েছে। মূল দুঃখের চেয়ে অভিনয়ের দুঃখই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। একমাত্র ব্যতিক্রম সন্তানের মৃত্যুতে মায়ের দুঃখ। যে বাড়িতে মায়ের কোন সন্তান মারা যায় সে বাড়িতে আমি কখনই যাই না। সন্তান শোকে কাতর মায়ের সামনে দাঁড়ানোর ক্ষমতা হিমুদের দেয়া হয়নি।

আমি রাত ন' টার দিকে ফাতেমা খালার বাড়িতে উপস্থিত হলাম। বাড়ি ভর্তি মানুষ। ফাতেমা খালা নাকি এর মধ্যে কয়েকবার অজ্ঞান হয়েছেন। এখন একটু সুস্থ। ডাক্তার রিলাক্সেন খেয়ে অন্ধকার ঘরে শুয়ে থাকতে বলেছে। তিনি তাঁর শোবার ঘরে শুয়ে আছেন। সেই ঘরে কারোর যাবার হুকুম নেই।

হুকুম ছাড়াই আমি শোবার ঘরে ঢুকে গেলাম। খালা আমাকে দেখে হেঁচকির মত শব্দ তুলে বললেন, 'হিমু রে, আমার সর্বনাশ হয়ে গেল রে। লেবু চা খেতে চেয়েছিল — বুঝলি। ঘরে লেবু ছিল না বলে আদা চা বানিয়ে নিয়ে গিয়ে দেখি এই অবস্থা। নড়ে না, চড়ে না, চেয়ারে কাত হয়ে আছে। মানুষটার শেষ ইচ্ছাও পূর্ণ হল না। সামান্য লেবু চা, তাও খেতে পারল না।'

'ঘরে লেবু ছিল না?'

'বুঝলি হিমু, আসলে ছিল। পরে আমি ফ্রিজের দরজা খুলে দেখি ভেজা ন্যাকরা দিয়ে মুড়ানো চার-পাঁচটা কাগজি লেবু।'

'ভেজা ন্যাকরা দিয়ে মুড়ানো কেন?'

'কাজের মেয়েটা যে আছে জাহেদার মা— সে কি যে বোকা তুই চিন্তাও করতে পারবি না। তাকে একবার বলেছিলাম, পান ভেজা ন্যাকরা দিয়ে মুড়ে রাখতে। এর পর থেকে সে করে কি, যা-ই পায় ভেজা ন্যাকরা দিয়ে মুড়ে রাখে।'

খালা উত্তেজিত ভঙ্গিতে বিছানায় উঠে বসলেন। আমি এখন স্বস্তি বোধ করছি। খালাকে মৃত্যুশোক থেকে বের করে কাজের মেয়ের সমস্যায় এনে ফেলে দেয়া হয়েছে।

'হিমু শোন, এই মেয়েটা আমাকে যে কি যন্ত্রণার মধ্যে ফেলে তুই কল্পনাও করতে পারবি না। মাঝে-মধ্যে ইচ্ছা করে ওর গায়ে এসিড ঢেলে দেই।'

'সে কি?'

'তোর খালু মারা গেছে সকাল দশটায়। এগারোটা থেকে লোকজন আসতে শুরু করেছে। আর তখন জাহেদার মা শুরু করেছে কান্না। আছাড় পিছাড় কান্না। বাড়িঘর ভেঙ্গে পড়ে যায় এমন অবস্থা। আমি তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললাম, খবর্দার, চোখের পানি, চিৎকার সব বন্ধ। আরেকটা চিৎকার যদি করিস গলা টিপে মেরে ফেলব।'

'কেন?'

'আরে বুঝিস না কেন —তার কান্নাকাটি দেখে লোকজন ভাববে না — বাড়ির বুয়া এত কাঁদে কেন? রহস্যটা কি? তার উপর মেয়েটা দেখতে ভাল। শরীর স্বাস্থ্যও ভাল। ভারী বুক, ভারী কোমর। মাথার চুলও লম্বা। চুলে গোপনে

গোপনে শ্যাম্পু দেয়। আমার শ্যাম্পুর বোতল ফাঁক করে দেয়। এত সাজগোজ লোকজন উল্টাপাল্টা ভাবতে পারে না?'

'তা তো পারেই।'

'এইসব কথা তো কাউকে বলতেও পারি না। তুই এসেছিস, তোকে বলে মনটা হালকা হল। চা খাবি?'

'না।'

'খা এক কাপ চা। তোর সঙ্গে আমিও খাই। যন্ত্রণায় মাথা ফেটে যাচ্ছে। আমি তো আর এই অবস্থায় চা দিতে বলতে পারি না। সবাই বলবে স্বামীর লাশ কবরে নামিয়েই চা কফি খেয়ে বিবিয়ানা করছে। ভাঙ্গা দরজারও ছিটকিনি আছে। মানুষের মুখের তো আর ছিটকিনি নেই। তুই যা, চায়ের কথা বলে আয়।'

চা খেতে খেতে খালা পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়ে গেলেন। কোথায় শোক, কোথায় কি? সব জলে ভেসে গেল।

'বুঝলি হিমু, তোর সঙ্গে কথা বলে আরাম আছে। তুই যে কোন কথা সহজভাবে নিতে পারিস, বেশির ভাগ মানুষ তা পারে না। একটা সাধারণ কথার দশটা বাঁকা অর্থ বের করে। এখন থেকে তুই আমাকে পরামর্শ দিবি, বুঝলি। তোর পরামর্শ আমার দরকার।'

'কি পরামর্শ?'

'তোর খালু মেলা টাকা রেখে গেছে। বিলি ব্যবস্থার ব্যাপার আছে।'

'কত রেখে গেছেন?'

'পুরোপুরি জানি না। আন্দাজ করতে পারছি। ভয়ে আমার হাত-পা পেটে ঢুকে যাচ্ছেরে হিমু।'

'কেন?'

'টাকাওয়ালা মানুষের দিকে সবার নজর। তাছাড়া আমি মেয়েমানুষ। তোর খালুর আত্মীয়-স্বজনরা এখন সব উদয় হবে। মড়া কান্না কাঁদতে কাঁদতে আসবে। তারপর সুযোগ বুঝে হায়েনার মত খুবলে ধরবে।'

'তুমি বড় হায়েনা হয়ে হাহা করে এমন হাসি দেবে যে হাসি শুনে ওরা পালাবার পথ পাবে না।'

'রসিকতা করিস না। সব দিন রসিকতা করা যায় না। এই বাড়িতে আজ একটা মানুষ মারা গেছে— এটা মনে রাখিস। এখনো কবরে নামেনি। আচ্ছা শোন— কুলখানির একটা ভাল আয়োজন করা দরকার না?'

'অবশ্যই দরকার। এমন খাওয়া আমরা খাওয়াব যে সবার পেটে অসুখ হয়ে যাবে। পরের এক সপ্তাহ ওরস্যালাইন খেতে হবে।'

খালা গম্ভীর গলায় বললেন, 'হিমু, তুই আবার ফাজলামি শুরু করেছিস। তোকে অসহ্য লাগছে। একটা মৃত মানুষের জন্যে তোর সম্মান থাকবে না? তুই কি অমানুষ?'

'ঠিক জানি না খালা। আমি কি তা পরে সবাই মিলে ঠিক করলেই হবে। আপাতত এসো কুলখানির মেনু ঠিক করি। তুমি কি খেতে চাও?'

'আমি কি খেতে চাই মানে? ফাজিল বেশি হয়েছিস। ধরাকে সরা জ্ঞান করছিস? আমার সঙ্গে রসিকতা। তুই এক্ষুনি বিদেয় হ। এই মুহূর্তে।'

'চলে যাব?'

খালা রাগে জ্বলতে জ্বলতে বললেন, 'অবশ্যই চলে যাবি। আমি কি খেতে চাই জিজ্ঞেস করতে তোর মুখে বাধল না? শোন হিমু, আর কোনদিন তুই এ বাড়িতে আসবি না।'

আমি খুবই সহজভাবে বললাম, 'তুমি ডাকলেও আসব না?'

খালা তীব্র গলায় বললেন, 'না, আসবি না। তোর জন্যে এ বাড়ির দরজা বন্ধ। হাবার মত বসে আছিস কেন? চলে যেতে বললাম, চলে যা।'

আমি চলে এলাম। খালা আর ডাকলেন না, আমিও গেলাম না।

দু'বছর হয়ে গেল। ফাতেমা খালা কাঁটায় কাঁটায় দু'বছর পর ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি আবারো যাচ্ছি। তার মধ্যে কি পরিবর্তন দেখব কে জানে। ম্যানেজার সাহেবকে দেখে শংকিত বোধ করছি। মনে হচ্ছে বড় ধরনের পরিবর্তন দেখতে পাব। কে জানে, হয়ত দেখব শাড়ি ফেলে দিয়ে স্কার্ট টপ ধরেছেন। চুল বব করিয়ে ফেলেছেন। মাথার সাদা চুলে আগে মেন্দি দিতেন। এখন সম্ভবত ব্লিচ করাচ্ছেন।

'ম্যানেজার সাহেব।'

'জ্বি।'

'ফাতেমা খালা — আপনার ম্যাডাম আছেন কেমন?'

'ভাল আছেন। গ্যাসের প্রবলেম হচ্ছে, চিকিৎসার জন্যে শিগগিরই সিঙ্গাপুর যাবেন।'

'গ্যাসের প্রবলেম মানে কি? পেটে গ্যাস হচ্ছে?'

'জ্বি।'

'খুবই দুঃসংবাদ। মেয়েদের পেটে গ্যাস একেবারেই মানায় না। গ্যাসের জন্যে সিঙ্গাপুর যেতে হচ্ছে?'

'গ্যাসটাকে তুচ্ছ করে দেখবেন না। গ্যাসের প্রবলেম থেকে অন্যান্য মেজর প্রবলেম দেখা দেয়। গ্যাস বেশি হলে উপরের দিকে ফুসফুসের ডায়াফ্রেমে চাপ দেয়, হার্টের ফাংশানে ইন্টারফেয়ার করে।'

আমি বিস্মিত গলায় বললাম, 'ভাই আপনি তো মনে হচ্ছে জ্ঞানী ম্যানেজার। ডাক্তারীও জানেন।'

ভদ্রলোক আমার রসিকতা পছন্দ করলেন না। গম্ভীর হয়ে গেলেন। সারা পথে তার সঙ্গে আমার আর কোন কথাবার্তা হল না। এবার একটা সিগারেট ধরিয়ে ছিলাম— ম্যানেজার সাহেব কঠিন গলায় বললেন, 'গাড়িতে এসি চলছে। সিগারেট ফেলে দিন।'

আমি বড়ই সুবোধ ছেলে হয়ে গেলাম। সিগারেট ফেলে দিলাম।

ফাতেমা খালাকে দেখে আমি ছোটখাট একটা চমক খেলাম। স্কার্ট টপ না, তিনি সাধারণ শাড়ি–ব্লাউজই পরে আছেন। সাধারণ মানে বেশ সাধারণ — সুতি শাড়ি। হালকা সবুজ রঙে সাদা সুতার কাজ করা। তার পরেও তাঁকে দেখে চমকাবার কারণ হচ্ছে তাঁকে খুকী খুকী দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে দশ বছর বয়স কমে গেছে। মুখ হাসি হাসি। পান খেয়েছেন বলে ঠোঁট লাল হয়ে আছে। সারা শরীরে সুখী সুখী ভাব। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা।

খালা বললেন, 'হা করে কি দেখছিস?'

'তোমাকে দেখছি। তোমার ব্যাপারটা কি?'

'কি ব্যাপার জানতে চাস?'

'তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন?'

'কেমন দেখাচ্ছে?'

'খুকী খুকী দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে দশ বছর বয়স কমিয়ে ফেলেছ।'

'ফাজলামি করিস না হিমু।'

'ফাজলামি করছি না। আমার এই হলুদ পাঞ্জাবীর শপথ, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার বয়স কুড়ি বছর কমেছে।'

'একটু আগে তো বললি দশ বছর কমেছে।'

'শুরুতে দশ বছর মনে হচ্ছিল — এখন মনে হচ্ছে কুড়ি । ব্যাপারটা কি?'

খালা আনন্দিত গলায় বললেন, 'ফুড হেবিট চেঞ্জ করেছি। এখন এক বেলা ভাত খাই। শুধু রাতে। তাও গাদা খানিক খাই না, চায়ের কাপের এক কাপ ভাত। আতপ চালের ভাত। দিনে শাকসব্জি, ফলমূল খাই। সেই সঙ্গে ভিটামিন।'

'কি ভিটামিন?'

'ভিটামিন ই। এন্টি এজিং ভিটামিন। খুব কাজের। ভিটামিন ই ক্রীম পাওয়া যায়। ঐ ক্রীম মুখে মাখি। গুলশানে একটা হেলথ ক্লাবে ভর্তি হয়েছি। ফ্রী হ্যান্ড একসারসাইজ করি। একসারসাইজের পর সোয়ানা নেই। সোয়ানার পর আধঘন্টা সুইমিং করি। সোয়ানাটা শরীরে ফ্যাট কমানোর জন্যে খুব উপকারী।'

'সোয়ানাটা কি?'

'স্টীম বাথ। দশ–পনেরো মিনিট স্টীম বাথ নিলে শরীর পুরোপুরি রিলাক্সড হয়ে যায়। টেনশান কমে। সুস্থ থাকার প্রধান রহস্য টেনশান ফ্রী থাকা।'

'সোয়ানা–ফুয়ানা নিয়ে তুমি যে টেনশান ফ্রী হয়েছ এটা তোমাকে দেখে বোঝা যাচ্ছে এবং খুবই ভাল লাগছে। তোমাকে মায়াবতী লাগছে। তবে তোমার ম্যানেজার বলছিল তুমি নাকি মায়াবতীর সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসোবতী হয়েছ। গ্যাস ছেড়ে আসার জন্যে সিঙ্গাপুর যাচ্ছ।'

খালা গম্ভীর গলায় বললেন, 'গ্যাসোবতী হয়েছি মানে — কি ধরনের কথা বলছিস। গুরুজনদের সঙ্গে কথা বলার সময় সম্মান রেখে কথা বলবি না? আমি তোর খালা না? আমি কি তোর ইয়ার–বান্ধবী?'

'অবশ্যই তুমি আমার খালা। ধনবতী খালা। আমাকে ডেকেছ কেন বল?'

'তাড়াহুড়া করছিস কেন? বলব। তোকে খুব জরুরী কাজে ডেকেছি। গুছিয়ে না বললে তুই বুঝবি না। সময় নিয়ে বলতে হবে। তুই তো একেবারে কাকের মত হয়ে গেছিস, খুব রোদে রোদে ঘুরিস?'

'হুঁ ঘুরি।'

'আজকের জন্যে ঘোরাঘুরি বাদ দে। বাড়িটা নতুন করে ঠিকঠাক করেছি। ঘুরে ফিরে দেখ, মজা পাবি। সপ্তাহখানিক পরে এলে সোয়ানা পাবি। আর্কিটেক্টকে ডেকে সোয়ানা বানাতে বলে দিয়েছি। রোজ রোজ গুলশানে গিয়ে পোষায় না।'

'ভাল করেছ।'

'সোয়ানাটা বানানো হলে তোর যখন ইচ্ছা করে সোয়ানা নিয়ে যাবি। দারোয়ানকে বলে দেব— আমি না থাকলেও ঢুকতে দেবে।'

'থ্যাংক য়্যু।'

'একটা সুইমিং পুল দেবার ইচ্ছা ছিল। আর্কিটেক্ট বলল, সম্ভব না। জায়গা নেই। ছাদের উপর যে করব সে উপায়ও নেই। সুইমিং পুলের লোড নেয়ার মত স্ট্রাকচারাল স্টেংগথ বাড়ির নেই।'

'নতুন বাড়ি করছ না কেন?'

'নতুন বাড়ি করার কথা মাঝে মাঝে মনে হয়। বাড়ি করা কোন ব্যাপার না। গুলশানে তোর খালু জায়গা কিনে রেখেছিল। ভাবলাম কি দরকার পুরানো

বাড়িতে তো ভালই আছি। তাছাড়া তোর খালুর স্মৃতি এই বাড়িতে আছে। মানুষটা তো হারিয়েই গেল, তার স্মৃতিটা থাক। কি বলিস?'

'ঠিকই বলছ।'

'আমার ম্যানেজার কেমন দেখলি?'

'স্যুট পরা ম্যানেজার?'

'আমিই বলেছি স্যুট পরতে। স্মার্ট লাগে। পায়জামা-পাঞ্জাবী পরা একটা লোকের কথায় মানুষ যতটা গুরুত্ব দেয় স্যুট পরা মানুষের কথায় তারচে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়।'

'মানুষটা কে তার উপরেও কিছুটা নির্ভর করে। নেংটি পরা মানুষের কথাও লোকজন খুব গুরুত্ব দিয়ে শুনে, যদি মানুষটা হয় মহাত্মা গান্ধী।'

'ফালতু কথা বলিস না তো হিমু, মহাত্মা গান্ধীকে আমি ম্যানেজার হিসেবে পাব কিভাবে? আমি যা পেয়েছি তাই ভাল। খুব চালাক চতুর ছেলে। মাছির মত চারদিকে চোখ। সব দেখছে। সমস্যা হলে নিজেই ডিসিশান নিচ্ছে, তেমন প্রয়োজন হলে আমাকে জানাচ্ছে। কোটি কোটি টাকার ব্যাপার বুঝতেই তো পারছিস।'

'টাকা এখনো খরচ করে শেষ করতে পারনি?'

'কি বলছিস তুই? তোর কি ধারণা, হাতে টাকা পেয়ে দুই হাতে উড়াচ্ছি? খুব ভুল ধারণা। খরচ তো অবশ্যই করছি। টাকা তো খরচের জন্যেই। ব্যাংকে জমা রেখে টাকার ডিম পাড়ানোর জন্যে না। তবে খরচ-টরচ করেও তোর খালু যা রেখে গেছে সেটাকেও বাড়িয়েছি। গুলশানের এত বড় জায়গা শুধু শুধু ফেলে রেখেছিল — রিয়েল এস্টেট কোম্পানিকে দিয়ে দিয়েছি। আমাকে চারটা ফ্ল্যাট দিচ্ছে, প্লাস এক কোটি টাকা ক্যাশ — বুলবুলই সব ব্যবস্থা করেছে।

'বুলবুল তোমার ম্যানেজার?'

'হুঁ, ভাল নাম রকিবুল ইসলাম। ডাকনাম বুলবুল। আমি বুলবুলই ডাকি।'

'বুলবুল সাহেব তাহলে তোমার ডান হাত?'

'তা বলতে পারিস— খুব ওস্তাদ ছেলে। হঠাৎ করে তোর খালুর এক আত্মীয় সেদিন বের হল, সৎ বোন। সম্পত্তির ভাগ নিয়ে হৈচৈ শুরু করল। ছোট আদালতে মামলাও করে দিল। বুলবুল তাকে এমন প্যাঁচে ফেলেছে যে তার চৌদ্দটা বেজে গেছে। এখন কেঁদে কূল পাচ্ছে না। আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আমি তামান্নাকে বললাম, বলে দাও আমার সঙ্গে দেখা হবে না। তারপরেও যাবে না। শুরু করেছে কান্নাকাটি। আমি তামান্নাকে বললাম, যেভাবে পার ঐ মহিলাকে বিদায় কর। একবার বলেছি দেখা করব না — দেখা করব না।'

'তামান্না আবার কে?'

'ও আচ্ছা, তামান্নার কথা তো তোকে বলা হয়নি— আমার পি.এ.। বুলবুল যেমন শক্ত, তামান্না তেমনি নরম। উঁচু গলায় কাউকে কোন কথা বলা তার পক্ষে সম্ভব না। তুই তার সঙ্গে একটু কঠিন হয়ে কিছু বলবি ওম্নি দেখবি মেয়ের চোখ ছলছল করছে।'

'তামান্নাকে দেখছি না তো।'

'দেখবি। আজ রোববার তো, ওর আসতে দেরি হবে। রোববার সে তার সংসারের জন্যে বাজার করে। সংসার মানে ভাই-বোন, মা-বাবার সংসার। তামান্না বিয়ে করেনি। বিয়ে করবেই বা কিভাবে? ঘাড়ে এত বড় সংসার। যাই হোক, ওকে নিয়ে আর তোকে নিয়ে আমার একটা প্ল্যান আছে।'

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, 'এই জন্যে তুমি আমাকে আনিয়েছ?'

খালা হাসিমুখে বললেন, 'তোকে আনিয়েছি অন্য কারণে। সেটা এখন না, পরে বলব। তার সঙ্গে তামান্নার সম্পর্ক নেই। যাই হোক, তুই তামান্নাকে দেখ। তার সঙ্গে কথাবার্তা বল। সারাজীবন পথে পথে ঘুরবি নাকি? হিমুগিরি তো অনেকদিন করলি, আর কত। ঘর-সংসার করবি না? মুসলমান ধর্ম, হিন্দু ধর্ম না — সংসার ধর্মই আসল ধর্ম।'

'মেয়েটা দেখতে কেমন?'

'সাধারণ বাঙালি মেয়ের মত। সাধারণের চেয়ে একটু ডাউনও হতে পারে। তবু খুব বেশি ডাউন না। চলে। আর তুই নিজেও তো বাগদাদের রাজপুত্র না। চেহারা করেছিস কাকের মত, চাকরি নেই, কিছু নেই। কাকের মতই এঁটোকাঁটা কুঁড়িয়ে খাচ্ছিস। যে মেয়ে তোকে বিয়ে করতে রাজি হবে বুঝতে হবে তার ব্রেইনে সমস্যা।'

'তামান্না তো তাহলে রাজি হবে না।'

'সেটা আমি দেখব। তুই একটা কাজ কর, হাত-মুখ ধুয়ে মোটামুটি ভদ্র ভাব ধরার চেষ্টা কর। এখনও খালি পায়ে থাকিস?'

'হুঁ।'

'দাঁড়া, স্যান্ডেল কিনিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা শোন, এক কাজ কর, আমি বুলবুলকে বলে দিচ্ছি ও তোকে স্যান্ডেল কিনে দেবে। নাপিতের দোকান থেকে চুল কাটিয়ে আনবে। ভাল একটা পাঞ্জাবী কিনে দেবে। অসুবিধা আছে?'

'কোন অসুবিধা নেই।'

খালা ম্যানেজারকে কি সব বললেন। নিচু গলায় বললেন, আমি কিছুই শুনলাম না।

ম্যানেজার সাহেব কর্মী মানুষ। তিনি প্রথমে আমার চুল কাটালেন। চুল কাটার সময় সামনে উপস্থিত থাকলেন এবং ক্রমাগত নাপিতকে ডিরেকশন দিতে লাগলেন— পেছনেরটা আরেকটু ছোট। সামনে বড়, জুলফি আরেকটু রাখ। চুল কাটাকে মনে হচ্ছিল শিল্পকর্ম এবং তিনি একজন মহান শিল্পনির্দেশক। মাথার চুলে পথের পাঁচালী বানানো হচ্ছে এবং তিনি সত্যজিৎ রায়।

চুল কাটার পর শ্যাম্পু করা হল, হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে চুল শুকানো হল। তারপর আমরা গেলাম স্যান্ডেল কিনতে। নিউ এলিফ্যান্ট রোড থেকে মেড ইন ইটালী স্যান্ডেল কিনলাম। মাখনের মত মোলায়েম স্যান্ডেল। স্যান্ডেল জোড়া যেন গুণগুণ করে গাইছে, 'চরণ ধরিতে দিও গো আমারে ……' পায়জামা পাঞ্জাবী কেনা হল। পাঞ্জাবীর উপর ফেলে রাখার জন্যে চাদর। সুতির চাদর তবে সুন্দর কাজ আছে।

ম্যানেজার সাহেব বললেন, 'চলুন, চশমা কিনে দেই।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'চশমা কেন? আমার তো চোখ খারাপ না।'

ম্যানেজার বিরক্ত মুখে বললেন, 'চোখ খারাপের চশমা না, গেটাপ চেঞ্জের চশমা। অনেক মানুষ আছে চশমা পরলে তাদের গেটাপে বিরাট পরিবর্তন হয়। যাদের চেহারায় মাংকি ভাব আছে —চশমা তাদের জন্যে মাষ্ট। মুখের অনেকখানি ঢেকে ফেলে।'

আমার চেহারায় মাংকি ভাব আছে তা জানতাম না। আমি শুধু বললাম, 'ও, আচ্ছা।'

'আপনি যেভাবে ও আচ্ছা বললেন তাতে মনে হল আপনি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। কথা সত্যি। গলায় টাই পরলে মানুষকে এক রকম লাগে, আবার টাইয়ের বদলে কাঁধে চাদর ফেললে অন্য রকম লাগে। তেমনি চশমা পরলে লাগবে এক রকম, চশমা না পরলে লাগবে আরেক রকম। সুন্দর ফ্রেম দেখে জিরো পাওয়ারের একটা চশমা কিনে দি চলুন।'

'চলুন।'

আমি ভোল পাল্টে ফেললাম। চশমা পরলাম। পাঞ্জাবী বদলে নতুন পাঞ্জাবী পরলাম। ড্রেসিং রুম ছিল না বলে পায়জামা বদলানো গেল না। কাঁধে ফেললাম চাদর। ম্যানেজার সাহেব ক্রিটিকের মত শুকনো গলায় বললেন, 'আপনাকে দেখতে ভাল লাগছে। বেশ ভাল লাগছে। প্রেজেন্টেবল। শুধু চুল কাটাটা তেমন ভাল হয়নি। আজকালকার নাপিত চুল কাটতে জানে না।'

'চলুন আরেকবার কেটে আসি। মনে আফসোস রাখা ঠিক না।'

ম্যানেজার সাহেব বললেন, 'না থাক, দেরি হয়ে যাচ্ছে। চলুন যাই।'

বাড়ি ফিরলাম। আমাকে দেখে ফাতেমা খালা মুগ্ধ গলায় বললেন, 'আরে তোকে তো চেনা যাচ্ছে না। তোর চেহারা থেকে চামচিকা ভাবটা মোটামুটি চলে গেছে।'

আমি কদমবুচি করে ফেললাম। খালা বললেন, 'ওকি, সালাম করছিস কেন?'

'নতুন জামা-কাপড় পরেছি এই জন্যে। তামান্না কি এসেছে খালা?'

'না আজ আসবে না। ওর বাসায় সমস্যা হয়েছে। ওর ছোট ভাইটা রিকশা থেকে পরে সিরিয়াস ব্যথা পেয়েছে। তামান্না ওকে নিয়ে গেছে হাসপাতালে। পুরো পরিবারটা মেয়েটার ঘাড়ে সিন্দাবাদের ভূতের মত চেপে আছে। একা সে ক'দিক সামলাবে? দুর্গার মত তার তো আর চারটা হাত না, দুটা মোটে হাত।'

'খালা আমার মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে— এত ঝামেলা করে গেটাপ চেঞ্জ করা হল, কোন কাজে লাগল না। তামান্নার সঙ্গে দেখা হল না। এক কাজ করলে হয় না? ঠিকানা দাও বাসায় চলে যাই।'

'বাসায় গিয়ে কি করবি?'

'তামান্নাকে বলব, আমাকে ফাতেমা খালা পাঠিয়েছেন। আপনার ছোট ভাই রিকশা থেকে পরে ব্যথা পেয়েছে— ঐ ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে বলেছেন। তামান্নার ছোট ভাইটার নাম কি খালা?'

'জামান।'

'জামানের বয়স কত?'

'পাঁচ বছর।'

'জামানের জন্যে বেলুন-টেলুন জাতীয় কোন গিফট নিয়ে গেলে কেমন হয় খালা?'

'তুই কি সত্যি যাবি?'

'অবশ্যই।'

'যাক, তোর মধ্যে কিছু চেঞ্জ তাহলে এসেছে। আমি ভেবেছিলাম তুই আর বদলাবি না।'

'বাসার ঠিকানা দাও, রিকশা ভাড়া দাও ঘুরে আসি।'

'তামান্নার বাসায় উপস্থিত হওয়াটা বাড়াবাড়ি হবে। আমি ব্যবস্থা করব, তুই চিন্তা করিস না। যে জন্য তোকে ডেকে আনালাম সেটি তো বলা হল না।'

'কখন বলবে?'

'আয়, শোবার ঘরে আয় —বলি।'

ফাতেমা খালার শোয়ার ঘরে আমি বসে আছি। খালা খাটে, আমি খাটের

সঙ্গে লাগোয়া চেয়ারে। খালা কথা বলছেন ফিস্‌ফিস্‌ করে। দরজাও ভেজিয়ে দেয়া হয়েছে। ঘর আধো অন্ধকার। কেমন ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্র ভাব। মিলিটারী ক্যু যখন হয় তখন সম্ভবত জেনারেলরা এইভাবেই কথা বলেন।

'একজন লোককে তুই খুঁজে বের করবি। লোকটার নাম ইয়াকুব। বাবার নাম সোলায়মান মিয়া। বয়স পঞ্চাশের উপর। তার স্থায়ী ঠিকানা আমার কাছে নেই। ঢাকায় যেখানে থাকতো সেই ঠিকানা আছে— অতীশ দীপংকর রোড। সেখানে এখন নেই। ম্যানেজারকে পাঠিয়েছিলাম। কোথায় গেছে তাও কেউ জানে না। তোর কাজ হচ্ছে ইয়াকুবকে খুঁজে বের করা। ঢোল পিটিয়ে খোঁজা যাবে না। চুপি চুপি খুঁজতে হবে।'

'তোমার ম্যানেজার যেখানে ফেল করেছে সেখানে আমি পাশ করব কিভাবে।'

'তুই পাশ করবি। তোর কাজই তো পথে পথে ঘোরা। আর ইয়াকুব লোকটা খুব সম্ভব পথে পথেই থাকে।'

'যদি পাই কি করব? কানে ধরে তোমার কাছে নিয়ে আসব?'

'আমার কাছে আনতে হবে না। খবর্দার আমার কাছে আনবি না। তুই তার সঙ্গে গল্পগুজব করবি।'

'ইয়াকুব সাহেবকে খুঁজে বের করে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করব, এই আমার কাজ?'

'হুঁ।'

'খালা আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। কি ধরনের গল্পগুজব করব? দেশের রাজনীতি? হাসিনা-খালেদা সংবাদ?'

খালা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'দাঁড়া, তোকে পুরো ব্যাপারটা খুলে বলি। পুরো ঘটনা না শুনলে তুই গুরুত্বটা বুঝবি না। আমাকে কথা দে যে দ্বিতীয় কেউ জানবে না। কসম কাট।'

'কসম কাটছি কেউ জানবে না।'

'এইভাবে কেউ কসম কাটে? তোর কোন প্রিয় মানুষের নামে কসম কাট।'

'তামান্নার কসম। দ্বিতীয় কেউ জানবে না।'

খালা অসম্ভব বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তোর সবকিছু নিয়ে ফাজলামিটা আমার অসহ্য লাগে। তোকে খবর দিয়ে আনাই ভুল হয়েছে। তামান্নার নামে কসম কাটছিস কোন হিসেবে? ও তোর অতি প্রিয়জন হয়ে গেল?'

'তুমিও আমার অতি প্রিয়। তোমার নামে কসম কাটব?'

'থাক কসম কাটতে হবে না। ঘটনাটা শোন — তোকে আল্লাহ্‌র দোহাই

লাগে কেউ যেন না জানে।'

'কেউ জানবে না খালা। আপনি নিশ্চিন্ত মনে বলুন।'

দরজা ভেজানোই ছিল। খালা উঠে গিয়ে লক করে দিলেন। এতেও তার মন ভাল না। তিনি আবার দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিয়ে আবার দরজা বন্ধ করলেন। চেয়ার টেনে আমার কাছে নিয়ে এলেন। গলার স্বর আরো নামিয়ে ফেললেন, 'তোর খালুজান ছিল খুব বেষয়িক মানুষ। তার বিলি-ব্যবস্থা, হিসাব-নিকাশ খুব পরিষ্কার। তার মৃত্যুর পর টাকা-পয়সার কি করতে হবে না করতে হবে সব সে লিখে গেছে। উকিলকে দিয়ে সাক্ষি-সাবুদ দিয়ে উইল করে গেছে। সেই উইল ঘাঁটতে গিয়ে দেখি সর্বনাশ— ইয়াকুব নামের এক লোককে সে মালীবাগের বাড়ি আর নগদ দশ লাখ টাকা দিয়ে গেছে।'

'সে কি, কেন?'

'আমারো তো সেটাই প্রশ্ন— কেন? তোর খালুজানের কাছে সারাজীবনে একবার তার নাম শুনলাম না কোথাকার কোন ইয়াকুব —তাকে বাড়ি আর দশ লাখ টাকা। তোর খালুর কি ভীমরতি হয়েছে।'

'ভীমরতি-ফতি খালুজানের হবে না।'

'ঠিক বলেছিস সে ঐ টাইপের না। টাকা যখন দিয়েছে তখন কোন কারণেই দিয়েছে।'

'এ লোককে খুঁজে বার করা তোমার জন্যে খুব বোকামি হবে। ও আসবে বাড়ি আর নগদ টাকা নিয়ে ভ্যানিশ হয়ে যাবে। ভিনি ভিডি ভিসি।'

'গাধার মত কথা বলিস না তো হিমু। বাড়ি আর টাকা নেয়া অত সহজ— আমি শুধু জানতে চাই তোর খালুজানের সঙ্গে লোকটার সম্পর্ক কি ছিল? আমার ধারণা ফিস্‌ফাস কোন ব্যাপার?'

'ফিস্‌ফাস ব্যাপার মানে? ফিস্‌ফাসটা কি?'

'মেয়েঘটিত কিছু।'

'কিছুটা কি?'

'সেটা কি আর আমি জানি নাকি?'

'খালুজান যেমন মানুষ তাঁর তেমন ভীমরতি হওয়া সম্ভব না, তেমনি ফিস্‌ফাস হওয়াও সম্ভব না।'

'পুরুষ মানুষের পক্ষে সবই সম্ভব। পুরুষ জাতি বড়ই আজব জাতি।'

'তাহলে আমার কাজ হচ্ছে ইয়াকুবকে খুঁজে বের করে তার পেটের ভেতর

থেকে গল্প টেনে বের করে নিয়ে আসা।'

'হুঁ। পারবি না?'

'ইয়াকুব সাহেবকে খুঁজে বের করতে পারলে পারব।'

'বুঝলি হিমু, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন-টিজ্ঞাপন দিয়ে লোকটাকে পাওয়া যেত, কেন বিজ্ঞাপন দিচ্ছি না— বুঝতেই পারছিস।'

'তা পারছি।'

'তুই এই উপকারটা আমার কর। লোকটাকে খুঁজে বের কর। আমি তোকে খুশি করে দেব।'

'আচ্ছা।'

'খুঁজে বের করতে পারবি না?'

'মনে হয় পারব।'

'কিভাবে খুঁজবি?'

'রাস্তায় রাস্তায় হাঁটব— সন্দেহজনক কাউকে দেখলে জিজ্ঞেস করব, স্যার আপনার নাম কি ইয়াকুব? নাম যদি ইয়াকুব না হয় তাহলে আমার কোন কথা নেই। আর নাম যদি ইয়াকুব হয় তাহলে আমার একটা কথা আছে। কথাটা হচ্ছে আপনার পিতার নাম কি?'

'হিমু।'

'কি খালা?'

'তুই তো মনে হয় আমার সঙ্গে ইয়ারকি করছিস। তোকে ইয়ারকি করার জন্যে আমি ডাকিনি। আমি খুব ভাল করে জানি ইয়াকুব নামের লোকটাকে খুঁজে বের করা তোর কাছে কোন ব্যাপার না। ইচ্ছা করলে তুই তিন দিনের মাথায় লোকটাকে বের করে ফেলবি। এই জন্যেই তোকে ডাকিয়েছি।'

'আচ্ছা ঠিক আছে।'

'তুই লোকটাকে খুঁজে বের কর। আমি কথা দিচ্ছি তোকে খুশি করে দেব।'

'আমি তো সব সময় খুশি হয়েই আছি। তুমি এরচে বেশি খুশি কি করে করবে?'

'বললাম তো তোকে খুশি করব। কিভাবে করব সেটা তখন দেখবি।'

'আজ তাহলে বিদায় হই খালা?'

'আচ্ছা যা।'

'স্যান্ডেল চশমা এইসব রেখে যাই? তামান্নার সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা যখন হবে তখন পরব। খালি পায়ে হেঁটে অভ্যাস হয়ে গেছে। স্যান্ডেল পায়ে পথে

নামলে হুমড়ি খেয়ে চলন্ত ট্রাকের সামনে পড়ে যেতে পারি। তেমন কিছু ঘটলে ইয়াকুব সাহেবের সন্ধান পাবে না। সেটা ঠিক হবে না।'

'তোর যা ইচ্ছা কর। তোর কথাবার্তা একনাগাড়ে শোনা অসম্ভব ব্যাপার। তুই যে কি বলিস না বলিস তা বোধহয় তোর নিজেরো জানা নেই।'

আমি স্যান্ডেল, চাদর, চশমা রেখে খালার বাড়ি থেকে বের হলাম। গেটের দারোয়ান সন্দেহের চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে। আচ্ছা, এই দারোয়ানের নাম ইয়াকুব না তো? বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা। অনুসন্ধান খালার বাড়ির গেট থেকেই শুরু হোক। দারোয়ানের বয়স চল্লিশের উপরে। কাজেই তাকে সন্দেহভাজনদের তালিকায় রাখা যেতে পারে। আমি থমকে দাঁড়ালাম। দারোয়ানের কাছে এগিয়ে এসে বললাম, 'কে ইয়াকুব না? ইয়াকুব কেমন আছ? ভাল?'

দারোয়ান থতমত খেয়ে বলল, 'স্যার আমার নাম কালাম।'

'ও আচ্ছা, কালাম তোমার চেহারা অবিকল ইয়াকুবের মত। সেই রকম নাক, সেই রকম মুখ। তোমার চোখও ইয়াকুবের মতই ট্যারা। ভাল কথা, ইয়াকুব নামে কাউকে চেন?'

'জ্বে না।'

'না চেনাই ভাল। ডেনজারাস লোক।'

আমি লম্বা লম্বা পা ফেলে এগুচ্ছি। দারোয়ানের বিস্ময় এখনো কাটছে না। সে তাকিয়ে আছে। আচ্ছা, বিস্ময় নামক মানবিক আবেগ কত ধরনের হতে পারে? কি কি কারণে আমরা বিস্মিত হই?

অন্যের বোকামি দেখে বিস্মিত হই।

অন্যের বুদ্ধিমত্তা দেখেও বিস্মিত হই।

এখানেও সমস্যা আছে। যে মহাবোকা সে অন্যের বোকামি দেখে বিস্মিত হবে না। সে সেটাই স্বাভাবিক ধরে নেবে। বিজ্ঞানীদের উচিত বিস্ময় ব্যাপারটা নিয়ে গবেষণা করা। বিস্ময় মিটার জাতীয় যন্ত্র বের করে ফেলা। যে যন্ত্র মানুষের চোখের পলকে বিস্ময় মেপে ফেলবে। বিস্ময় মাপা হবে এক থেকে দশের মধ্যে। লগারিদমিক স্কেলে। দশ হবে বিস্ময়ের সর্বশেষ সীমা। একজন মানুষের জীবনে মাত্র দু'বার বিস্ময় মিটারের সর্বশেষ মাপ দশে উঠবে।

প্রথমবার হবে যখন সে মায়ের গর্ভ থেকে পৃথিবীতে ভূমিষ্ট হবে। পৃথিবী দেখে বিস্ময় দশ। আর শেষবার আবারো বিস্ময় মিটারের মাপ দশ হবে যখন সে

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াবে। পৃথিবী অন্ধকার হয়ে আসতে শুরু করবে, সে হতভম্ব হয়ে ভাববে— কি হতে যাচ্ছে? একি, আমি কোথায় যাচ্ছি?

যারা খুব ভাগ্যবান মানুষ তাদের কেউ কেউ এক জীবনে বিস্ময় মিটার আরো এক দু'বার হয়ত দশ স্কোর করবেন। নেইল আর্মস্ট্রং যখন চাঁদে নামলেন তখন তিনি দশ স্কোর করলেন।

টমাস আলভা এডিসন ফনোগ্রাফ আবিষ্কার করলেন। এমন এক যন্ত্র যা মানুষের কথা বন্দি করে ফেলতে পারে। আসলেই তা পারে কিনা তা পরীক্ষার জন্যে নিজেই যন্ত্রের সামনে বসে বিড়বিড় করে একটা ছড়া বললেন —

Mary had a little lamb
Its fleece was as white as snow
And every where that Mary went
That lamb was sure to go.

ছড়া শেষ করে উত্তেজনায় কপালের ঘাম মুছলেন। তার গলার শব্দ আসলেই কি যন্ত্রটা বন্দি করতে পেরেছে? তিনি যন্ত্র চালু করলেন — যন্ত্রের ভেতর থেকে শব্দ আসতে লাগল —

Mary had a little lamb

সেদিন বিস্ময় মিটার ফিট করে রাখলে টমাস আলভা এডিসনের বিস্ময় দশ বা দশের কাছাকাছি হত।

আচ্ছা আমি এইসব কি ভাবছি? মূল দায়িত্ব পাশ কাটিয়ে যাচ্ছি। আমাকে ইয়াকুব সাহেবের সন্ধান করতে হবে। বরশি ফেলে তার পেটের ভেতর থেকে কথা বের করে নিয়ে আসতে হবে।

পাজেরো একটা জীপ রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। জীপের মালিক বিরসমুখে বসে আছে। বিরসমুখের কারণ গাড়ির চাকার হাওয়া চলে গেছে। ড্রাইভার চাকা বদলাচ্ছে। আচ্ছা পাজেরোর মালিকের নাম কি ইয়াকুব হতে পারে না? আমি কেন ধরে নিচ্ছি ইয়াকুব লোকটা হবে হতদরিদ্র? সে বিত্তশালীও তো হতে পারে।

আমি ভদ্রলোকের কাছে এগিয়ে গেলাম। ভদ্রলোক তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন। সেই দৃষ্টিতে খানিকটা সন্দেহও আছে। পাজেরোর মালিকরা সবার দিকে খানিকটা সন্দেহ নিয়ে তাকান।

'স্যার কিছু মনে করবেন না, আপনার নাম কি ইয়াকুব?'

কোন জবাব আসছে না। আমি হাসিমুখে বললাম, 'স্যার আপনার যে ড্রাইভার তার নাম কি? বাই এনি চান্স ইয়াকুব না তো? আমি ইয়াকুবের সন্ধানে বের হয়েছি। আমাকে একটু সাহায্য করুন।

I need your friend help.'

পাগলদের দিকে মানুষ যে দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, ভদ্রলোক সেই দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। এতক্ষণ তার চোখ ভর্তি ছিল সন্দেহ। এখন সেই সন্দেহের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভয়। তিনি দ্রুত গাড়ির কাচ উঠাচ্ছেন। গাড়ির কাচে নাক চেপে ভদ্রলোককে ভেংচি কাটলে কেমনে হয়। ভয়ে তার নিশ্চয়ই পিলে চমকে যাবে। পাজেরোর মালিকরা ঝড়ের বেগে গাড়ি চালিয়ে আমার মত নিরীহ পথচারীকে ভয় দেখান। কাজেই সুযোগ মত তাদেরকেও ছোটখাট ভয় দেখাবার অধিকার আমার আছে। আমি গাড়ির কাচে নাক চেপে জিভ বের করে সাপের মত এদিক-ওদিক করতে লাগলাম এবং ঘেঁষ ঘেঁষ জাতীয় শব্দ করতে লাগলাম। পাজেরো মালিক ভয়ে এবং আতংকে কেমন জানি হয়ে গেছেন। তার সঙ্গে নিশ্চয়ই মোবাইল ফোন নেই। থাকলে পুলিশকে খবর দিতেন।



ইয়াকুবের সন্ধানে যাত্রা শুরু হল। কোন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে ঘর থেকে বের হবার আলাদা আনন্দ। নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। ছক্কুর দোকানে চা খেয়ে ফুটপাতে পা রাখা মাত্র নিজেকে কলম্বাসের মত মনে হল। একজন মানুষ, একটা মহাদেশের মত। মানুষকে আবিষ্কার এবং মহাদেশ আবিষ্কার একই ব্যাপার।

ফুটপাতে বিশাল এক পাথর।

পাথরে ধাক্কা খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবার জোগাড় হল। নিজেকে পতন থেকে অনেক কষ্টে সামলালাম। ডান পায়ের নখ কেটে রক্ত বের হচ্ছে। দু' হাতে পায়ের নখ চেপে বসে পড়তেই কে একজন জিজ্ঞেস করল, ভাইজান, আইজ কত তারিখ?

তাকিয়ে দেখি পাথরটা থেকে পাঁচ ছ' হাত দূরে এক মধ্যম বয়সী ভিখিরী। তার একটা চোখ নষ্ট। ভাল চোখটা অতিরিক্ত ভাল। সেই চোখের পাতা ক্রমাগত পিট পিট করছে। দৃষ্টিও তীক্ষ্ণ। একচক্ষু ভিখিরীই তারিখ জানতে চাচ্ছে। তার মুখে চাপা হাসি। পাথরের সঙ্গে ধাক্কা ব্যাপারটা দেখে সে মনে হয় মজা পেয়েছে। ভিখিরীদের জীবনে মজার অংশ কম। অন্যের দুঃখকষ্ট থেকে মজা আহরণ করা ছাড়া তাদের উপায় নেই। আমি বললাম, 'এই পাথরটা কি তুমি এখানে রেখে দিয়েছ?'

ভিখিরী গম্ভীর গলায় বলল, রাখলে অসুবিধা কি?

'না কোন অসুবিধা নেই। তুমি রেখেছ কিনা সেটা বল।'

'হঁ রাখছি।'

'প্রতিদিনই লোকজন এখানে ধাক্কা খাচ্ছে?'

'বেখিয়ালে হাঁটলে ধাক্কা খাইবই।'

'আজ সারাদিন ক' জন ধাক্কা খেয়েছে?'

'অত হিসাব নাই।'

'আমিই কি প্রথম?'

'জ্বি না —আফনে পরথম না।'

'নাম কি তোমার?'

'আমার নাম দিয়া আফনের কি দরকার?'

'কোন দরকার নেই, তারপরেও জানতে চাচ্ছি। তুমি যেমন কারণ ছাড়াই জানতে চাচ্ছিলে আজ কত তারিখ? আমিও সে রকম জানতে চাচ্ছি।'

'আমার নাম মেছকান্দর মিয়া। বাড়ি বরিশাল নবীনগর।'

'ভিক্ষা শেষ করে যখন বাড়িতে ফিরে যাও তখন পাথরটা কি কর, সঙ্গে করে নিয়ে যাও?'

'আমি পাথর নিমু ক্যান? পাথর কি আমার?'

'সারাদিনে তোমার রোজগার কত হয়?'

'এক জাগাত ভিক্ষা করি বইলা রোজগার কম। হাঁটাহাঁটিতে রোজগার বেশি।'

'হাঁটাহাটি কর না কেন?'

'ইচ্ছা করে না। সামান্য দুইটা পয়সার জন্যে অত খাটনী ভাল লাগে না। কারোর ইচ্ছা হইলে দিব। ইচ্ছা না হইলে নাই। আমি কি আফনের কাছে ভিক্ষা চাইছি?'

'না'

'আফনের কাছে যেমন ভিক্ষা চাই না, অন্যের কাছেও চাই না।'

'শুধু তারিখ জানতে চাও?'

'হঁ'

মেছকান্দর মিয়া তার ঝুলির ভেতর কি যেন খোঁজাখুঁজি করছে। এর ঝুলিও অন্যদের ঝুলির মত। শান্তিনিকেতনী কাপড়ের ব্যাগ। মেছকান্দর মিয়া বিড়ি বের করল। মুখে দিতে দিতে বলল, ফকির দুই কিসিমের আছে — ভিক্ষা চাওইন্যা ফকির। ভিক্ষা না চাওইন্যা ফকির। আমি হইলাম না চাওইন্যা।

'ভাল কোনটা, চাওইন্যাটা, না না চাওইন্যাটা?'

'ভাল-মন্দ দুই দিকই আছে।'

নখ থেকে রক্তপাত বন্ধ হচ্ছে না। আমি উঠে দাঁড়ালাম। রক্ত পড়ছে পড়ুক।

ভিক্ষুক আবারো বলল, 'স্যার তারিখ কত জানেন?'

আমি বললাম, 'জানি না। মনে করার চেষ্টা করছি। যদি মনে পড়ে তোমাকে জানিয়ে যাব। আর শোন, পাথরটাকে যত্নে রেখো, এটা সাধারণ পাথর না। এই পাথর রহস্যময়।'

মেছকান্দর আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আর আমি ভাবছি আজকের তারিখটা যেন কত? ফাতেমা খালার সঙ্গে দেখা হবার পর সাতদিন কি কেটে গেছে? আজকে কি ষষ্ঠ দিবস, না সপ্তম দিবস?

ঘরে তারিখ ভুলে গেলে দেয়ালে ক্যালেন্ডার দেখা যায় —পথে ক্যালেন্ডার ঝুলে না। নগরকর্তারা ধরে নেন যারা পথে নামে তারা তারিখ জেনেই নামে। এ জন্যেই শহরের মোড়ে মোড়ে ক্যালেন্ডার ঝুলে না।

ইদানীং ঢাকা শহর অনেক উন্নত হয়েছে — একটু পরপর দোকান সাজিয়ে চেংড়া ছেলেপুলে বসে আছে —আইএসডি টেলিফোন, দেশ-বিদেশে ফোন, ফ্যাক্স। এদের ব্যবসাও রমরমা। বাংলাদেশের মানুষ বিদেশে টেলিফোন করতে ভালবাসে।

ধাই ধাই করে যে দেশ এগুচ্ছে সে দেশের পথে পথে ক্যালেন্ডার থাকা দরকার। কাউকে কি জিজ্ঞেস করব আজ তারিখ কত? ক' টা বাজে জিজ্ঞেস করা সহজ। আজ কত তারিখ— জিজ্ঞেস করা খুব সহজ না। পরিচিত প্রশ্নের জবাব আমরা আগ্রহ করে দেই। অপরিচিত প্রশ্নের জবাব দিতে থমকে যাই। ভুরু কুঁচকে ভাবি লোকটা এই প্রশ্ন করল কেন? সে তারিখ জানতে চায় কেন? রহস্যটা কি?

রাস্তার পাশে চিন্তিত মুখে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর বোধহয় অফিসে যাবার তাড়া। বেবীটেক্সি দেখা মাত্র হাত উঁচু করছেন এবং এই বেবী এই বেবী করে চেঁচাচ্ছেন। আমি তার পাশে দাঁড়ালাম এবং অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললাম, স্যার আজ কত তারিখ?

যা ভেবেছিলাম তাই, ভদ্রলোক জবাব দিলেন না। এমনভাবে তাকালেন যেন আমি ভয়ংকর কোন মতলব নিয়ে তার কাছে এসেছি। শুরুতে ভাল মানুষের মত তারিখ জানতে চাচ্ছি, তারপরই নিচু গলায় ফিস্‌ফিস্ করে বলব, মানিব্যাগ বের করুন। আপসে মানিব্যাগ আমার হাতে দিয়ে চলে যান। নো সাউন্ড প্লীজ। আমি ভদ্রলোককে আরো ভড়কে দিলাম। মহা বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, এক্সকিউজ মি স্যার। আপনার নাম কি ইয়াকুব?

ভদ্রলোক কোন কিছু না বলে দ্রুত হাঁটতে শুরু করলেন। আজ মনে হয় তিনি বেবীটেক্সি নেবেন না। হেঁটেই অফিসে যাবেন। ভদ্রলোক হাঁটতে হাঁটতে একবার পেছনে ফিরলেন। ওম্নি আমি হাসলাম। হেসে তাঁর পেছনে পেছনে হাঁটা শুরু করলাম। ভদ্রলোক তাঁর হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলেন। আমিও বাড়িয়ে দিলাম। তিনি এখন প্রায় দৌড়াচ্ছেন। ভদ্রলোককে তাড়াতাড়ি অফিসে পৌঁছে দেবার ব্যাপারে সামান্য সাহায্য করছি। পরোপকার বলা যেতে পারে।

আচ্ছা নগরীর মানুষ কি বদলে যাচ্ছে? তারা এত সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠছে কেন? সবাই সবাইকে সন্দেহ করছে। আপনার নাম কি ইয়াকুব? এই নির্দোষ

প্রশ্নে আতংকে অস্থির হওয়ার মানে কি? আপনার নাম কি গোলাম আযম? এই প্রশ্নে শংকিত হওয়া যায়। এমন প্রশ্ন তো করছি না।

সামনের ভদ্রলোকের ভাগ্য ভাল। তিনি খালি বেবীটেক্সি পেয়ে প্রায় লাফিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে গেছেন। বেবীটেক্সির পেছনের জানালা দিয়ে কৌতূহলী হয়ে আমাকে দেখছেন। তার চোখ থেকে ভয় এখনো কাটেনি। আমি টা-টা, বাই-বাই ভঙ্গিতে হাত নাড়লাম। তিনি চট করে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। অফিসে ফিরে এই ভদ্রলোক আজ রোমহর্ষক সব গল্প শুরু করবেন। তার সহকর্মীরা চোখ বড় বড় করে গল্প শুনবে—

'ভয়ংকর এক বদমাশের পাল্লায় পড়েছিলাম। অল্পের জন্যে জীবনটা রক্ষা পেয়েছে। বেবীটেক্সির জন্যে অপেক্ষা করছি— হঠাৎ দেখি হলুদ পাঞ্জাবী পরা এক লোক এগিয়ে আসছে। তার একটা হাত পাঞ্জাবীর পকেটে। সে যখন আমার পাশে এসে দাঁড়াল, তখন বুঝলাম তার হাতে পিস্তল। মদ খেয়ে এসেছে। মুখ দিয়ে ভক ভক করে মদের গন্ধ আসছে। আমাকে বলল, 'তুমি ইয়াকুব?'

আমি বললাম, 'জ্বি না।'

সে বলল, 'মিথ্যা কথা বলছিস কেন? তোর নাম ইয়াকুব।' আমি হতভম্ব। কি বলব বা কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না।

সে বলল, 'কোন কথা না, আমার সঙ্গে গাড়িতে ওঠ। কুইক। নো সাউন্ড।'

আমি তাকিয়ে দেখি রাস্তার পাশে একটা মাইক্রোবাস দাঁড়িয়ে আছে। মাইক্রোবাসে ছয় জন বসে আছে। তাদের গায়েও হলুদ পাঞ্জাবী। সবাই তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমার হাত-পা জমে গেল। আমি কোনমতে বললাম, 'আপনি ভুল করছেন ....।'

শ্রোতারা হতভম্ব হয়ে গল্প শুনবে। তারা যতই হতভম্ব হবে, গল্পের ডালপালা ততই ছড়াবে এবং একটা সময় আসবে যখন এই ভদ্রলোক নিজেই নিজের গল্প বিশ্বাস করতে শুরু করবেন। তিনি যদি লেখক হন তাহলে তার আত্মজীবনীতে এই গল্প স্থান পাবে।

ফাতেমা খালার সঙ্গে কথা বলা দরকার। তাঁকে জানানো দরকার যে প্রজেক্ট ইয়াকুবের কাজকর্ম পূর্ণ উদ্যাম চলছে। অনুসন্ধান সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই চলছে। ভিক্ষুক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মেছকান্দর মিয়াকে দিয়ে অনুসন্ধানের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সাফল্য দ্বারপ্রান্তে। টেলিফোন কোত্থেকে করব বুঝতে পারছি না। সঙ্গে কার্ড নেই যে কার্ড ফোনে কথা বলব। টেলিফোনের দোকান খুলে যারা বসে আছে তাদের কাছে গেলে লাভ হবে না। তাদের হচ্ছে 'ফেল কড়ি মাখ তেল' ব্যাপার। মালীবাগে আমার একটা টেলিফোনের বাকির দোকান

আছে। সেখানে আমার নামে খাতা আছে। খাতায় নাম লিখে টেলিফোন করতে হয়। কল শেষ হবার পর দোকানের মালিক জগলু ভাই বিরস গলায় বলেন— 'টাকা তো অনেক জমে গেল হিমু সাহেব। কিছু অন্তত ক্লিয়ার করেন। আজ না পারলেও এই সপ্তাহের মধ্যে কিছু দিতে পারেন কিনা দেখেন। চা খাবেন?'

আমার টেলিফোনের এই বাকির দোকানের সবচে বড় সুবিধা হচ্ছে টেলিফোন শেষ হবার পর চা পাওয়া যায়। এক কাপ না, যত কাপ ইচ্ছা। দুপুরে গেলে জগলু ভাই জোর করে ভাত খাইয়ে দেন। রাতে বিপদে পড়লে ঘুমুবার ব্যবস্থাও আছে। জগলু ভাই রাতে দোকানে থাকেন। শোরুমের পেছনে বড় ঘর আছে। সেই ঘরের সবটা জুড়ে খাট পাতা। রাতে উপস্থিত হলে তিনি মহা বিরক্ত হয়ে বলেন—'কি ব্যাপার রাতে থাকবেন? বালিশ নেই, কোলবালিশ মাথার নিচে দিয়ে ঘুমুতে হবে। আর শুনুন, নাক ডাকাবেন না। আমি সব সহ্য করতে পারি, নাক ডাকা সহ্য করতে পারি না।'

জগলু ভাইয়ের দোকান থেকে ফাতেমা খালাকে টেলিফোন করলাম। ভারী গম্ভীর পুরুষ কণ্ঠ শোনা গেল— কে কথা বলছেন? ফাতেমা খালার ম্যানেজার।

আমি বললাম, 'বুলবুল নাকি? ভাল?'

'কে, হিমু সাহেব?'

'জ্বি।'

'দয়া করে আমাকে কখনো বুলবুল ডাকবেন না। বুলবুল আমার ডাকনাম। আমার ভাল নাম রকিবুল। আমি ডাকনামে পরিচিত হতে চাই না। আমি পরিচিত হতে চাই ভাল নামে।'

'মহাকবি শেক্সপীয়ার নাম প্রসঙ্গে একটা কথা বলেছিলেন — গোলাপকে তুমি যে নামেই ডাক সে গন্ধ ছড়াবে।'

'দয়া করে আমার সঙ্গে শেক্সপীয়ার কপচাবেন না। এবং আমাকে কখনো বুলবুল ডাকবেন না।'

'আমার যদি কোনদিন খালার মত কোটি কোটি টাকা হয় তাহলে কি আপনাকে বুলবুল ডাকতে পারব?'

'আপনি কি ম্যাডামের সঙ্গে কথা বলবেন?'

'জ্বি।'

'ধরুন দিচ্ছি। ম্যাডামের শরীরটা বেশি ভাল না। ডাক্তার তাকে মোটামুটি রেস্টে থাকতে বলেছেন। কাজেই টেলিফোনে আপনি বেশিক্ষণ কথা বলবেন না।'

'জ্বি আচ্ছা। ব্রাদার শুনুন, আজ কত তারিখ বলতে পারবেন?'

'তারিখ দিয়ে আপনি কি করবেন? তারিখ তো আপনার কোন কাজে আসার কথা না।'

'আমার জন্যে না। একজন ভিখিরী আমার কাছে তারিখ জানতে চাচ্ছিল। ভিখিরীর নাম মেছকান্দর মিয়া।'

'আজ ১৭ তারিখ। উনিশশো অষ্টআশি সাল। আপনি ধরে থাকুন। আমি ম্যাডামকে দিচ্ছি।'

খালা এসে টেলিফোন ধরলেন। চিঁচিঁ গলায় বললেন, 'কে হিমু? আমি মারা যাচ্ছিরে।'

'কি হয়েছে?'

'ঘুম হচ্ছে না। সারারাত জেগে থাকি।'

'সে কি।'

'সূর্য উঠার পর ঘুম আসে। তখন দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘুমাই। তাও খুব অল্পক্ষণ— ম্যাক্সিমাম দুই থেকে আড়াই ঘন্টা।'

'দুই আড়াই ঘন্টাই যথেষ্ট। নেপোলিয়ান তিন ঘন্টার বেশি ঘুমাতেন না।'

'গাধার মত কথা বলিস না, আমি কি নেপোলিয়ান?'

'অবশ্যই নেপোলিয়ান — মেয়ে মানুষ হয়ে এত বড় ব্যবসা দেখছ। তুমি কম কি? নেপোলিয়ানকে এই ব্যবসা দেখতে দেয়া হলে সে এক সপ্তাহের মধ্যে লাল বাতি জ্বালিয়ে সব ছেড়ে দূরে আসামের দিকে চলে যেত।'

'তোর কথাবার্তার ধরন আর পাল্টাল না। ইয়াকুবের খোঁজ বের করেছিস?'

'কাজ চলছে। শিগগিরই জানতে পারবে।'

'লোকটাকে বের করতে পারলে তোকে আমি ক্যাশ কুড়ি হাজার টাকা দেব।'

'টাকাটা আলাদা করে রাখ খালা — আমি দু'একদিনের মধ্যে আসামী হাজির করছি।'

'আরে গাধা, তোকে কি বলেছি আসামী হাজির করতে হবে না। শুধু পেট থেকে কথা বের করবি।'

'নো প্রবলেম।'

'তাহলে টেলিফোন রেখে দেই। কথা বলতে পারছি না। মাথা ছিঁড়ে পড়ে যাচ্ছে। অসম্ভব যন্ত্রণা।'

'জামান কেমন আছে খালা।'

'জামান কেমন আছে মানে? জামানটা কে?'

'ঐ যে তামান্নার ছোট ভাই —রিকশা থেকে পড়ে পায়ে ব্যথা পেল। আমি ঠিক করে রেখেছি কুড়ি হাজার টাকা পেলে ছেলেটাকে একটা লেগো সেট উপহার দেব। জামানের বোন ভাল আছে তো?'

'তামান্নার কথা বলছিস?'

হুঁ।'

'আশ্চর্য, এখনো তোর মাথায় তামান্না আছে? আমি তো ভেবেছি সব ভুলে বসে আছিস। তোর যা নেচার। তোকে তো আমি আজ থেকে চিনি না। যাই হোক, তুই তামান্নার ব্যাপারে ভাবিস না। আমি সব ব্যবস্থা করব। আমি তামান্নাকে কিছু হিন্টস দিয়েছি। সরাসরি তোর কথা বলিনি— ঘুরিয়ে বলেছি। ও দেখি খুবই লজ্জা পাচ্ছে।'

'অতিরিক্ত লজ্জার জন্যে আবার পিছিয়ে পড়বে না তো?'

'পিছিয়ে যাবে কোথায় — আমি এমন চাল চালব।'

'খালা থ্যাংকস।'

'তোর পরিবর্তন দেখে আমি খুবই অবাক হচ্ছি। শোন হিমু, তোর জীবনটা আমি বদলে দেব। আমার ফার্মে তোকে চাকরি দেব।'

'স্যুট–টাই পরতে হবে?'

'পরতে হলে পরবি। স্যুট–টাই কি খারাপ? তোর হলুদ পাঞ্জাবীর চেয়ে ভাল।'

'তোমার মাথার যন্ত্রণা এখন একটু কম না?'

'হ্যাঁ কম। সকালে তো মাথা তুলতে পারছিলাম না এমন অবস্থা। তুই ইয়াকুবের খোঁজ পেলেই আমাকে জানাবি। আমি ঘুমিয়ে থাকলে ঘুম থেকে ডেকে তুলবি।'

'আচ্ছা, খালা একটা কথা —ইয়াকুব লোকটা দেখতে কেমন তা কি জান? মোটা না রোগা, লম্বা না বেঁটে?'

'কিছুই জানি না।'

'না জানলেও অসুবিধা নেই। দু'একদিনের মধ্যেই জানা যাবে লোকটা কেমন। আজও জানা যেতে পারে। কুড়ি হাজার টাকা ক্যাশ দিয়ো খালা। ক্রশড চেক দিলে বিরাট সমস্যা হবে। আমার ব্যাংকে একাউন্ট নেই।'

একটা টেলিফোন করলে খালে পড়ার সম্ভাবনা। আমি আবার সাঁতার জানি না। কাজেই বাধ্য হয়ে দ্বিতীয় টেলিফোন করলাম। তামান্নার ব্যাপারটা রূপাকে জানানো দরকার। আজকাল রূপাকে টেলিফোনে ধরা সমস্যা হয়েছে। প্রথম একজন কাজের লোক টেলিফোন ধরে। তার কাছে নাম ঠিকানা দিতে হয়।

অনেকক্ষণ টেলিফোনের রিসিভার কানে নিয়ে বসে থাকার পর দ্বিতীয় একজন টেলিফোন ধরে। তার কাছে দ্বিতীয় দফা নাম ঠিকানা দিতে হয়। সে বায়োডাটা পুরোটা শোনার পর বলে, ধরেন দেখি আপা বাসায় আছে কিনা। খুব সম্ভব নেই।

আজো তাই হল। ফার্স্ট রাউন্ড শেষ করে আমি সেকেন্ড রাউন্ডে উঠলাম। পুরুষ কণ্ঠ বলল, কার সঙ্গে কথা বলবেন রূপা আপার সঙ্গে?

আমি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, জ্বি।

'আপনার নাম?'

'আমার নাম মেছকান্দর?'

'কি বললেন? কি কান্দর?'

'মেছকান্দর।'

'আপনার পরিচয়?'

'আমি ধর্মমন্ত্রী মাওলানা এজাজুল কবীর সাহেবের পিএ। ধর্মমন্ত্রী আপার সঙ্গে কথা বলবেন। বিশেষ প্রয়োজন।'

'লাইনে থাকুন দিচ্ছি।'

'একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে। জোহরের নামাজের টাইম হয়ে গেছে মন্ত্রী সাহেব নামাজে দাঁড়াবেন।'

'জ্বি দিচ্ছি।'

'একটা সেকেন্ড। আপনার নাম তো ইয়াকুব তাই না?'

ভদ্রলোক হতভম্ব গলায় বললেন, জ্বি। আপনি কি করে জানেন।

আমি হাই তোলার মত শব্দ করতে করতে বললাম, আমাদের সব খোঁজ–খবর রাখতে হয়। জুমার নামাজ পড়া ছেড়ে দিয়েছেন ব্যাপার কি?

টেলিফোনের ওপাশ থেকে বিড় বিড় জাতীয় শব্দ হচ্ছে। ইয়াকুব সাহেবের বিস্ময় আকাশ স্পর্শ করেছে।

'স্যার একটু ধরেন আপাকে দিচ্ছি।'

'চার কলমা জানেন?'

'প্রথমটা শুধু জানি।'

'চারটা কলমাই শিখে রাখবেন। পরে আবার ধরব।'

'জ্বি আচ্ছা।'

রূপা টেলিফোন ধরেই বলল, কে হিমু?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

'সবার সঙ্গে তামাশা কর কেন? ইয়াকুবকে উল্টাপাল্টা কথা বলছ কেন?'

'উল্টাপাল্টা কথা তো কিছু বলছি না। চার কলমা মুখস্ত করতে বলেছি।'

'ওর নামই বা জানলে কিভাবে?'

'আন্দাজে ঢিল ছুঁড়েছি। ঢিল লেগে গেছে। আজকাল যে কোন লোকের সঙ্গে কথা হলে প্রথমেই জানতে চাই—তার নাম কি ইয়াকুব? কেন জানতে চাই বলব?'

'নিশ্চয়ই উদ্ভট কোন কারণ আছে। আমি এখন আর উদ্ভট কিছু শুনতে আগ্রহী না। তোমার উদ্ভট আচার-আচরণ এক সময় ভাল লাগতো। একটা বয়স থাকে যখন বিভ্রান্ত হতে ভাল লাগে। সেই বয়স আমি পার হয়ে এসেছি। হিমু শোন, আমার বয়স তোমার মত একটা জায়গায় স্থির হয়ে নেই। আমার বয়স বাড়ছে।'

'আমারো বয়স বাড়ছে। আমি এখন আর আগের হিমু না। পরিবর্তিত হিমু।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ তাই। এখন আমার মধ্যে পাখিদের স্বভাব দেখা যাচ্ছে। সন্ধ্যা হলে পাখিদের মত ঘরে ফিরে আসি। গত দু'টা পূর্ণিমায় আমি ঘর থেকে বের হইনি।'

'আচ্ছা।'

'শুধু তাই না, আমি ঠিক করেছি বিয়ের কথাবার্তা অনেকদূর এগিয়েছে। মেয়েটার নাম তামান্না। নাম সুন্দর না?'

'হ্যাঁ, নাম সুন্দর।'

'চেহারা ছবি তেমন না। বেশ খানিকটা ডাউন। তা আমার মত ছেলেকে ডাউন মেয়েরাই তো বিয়ে করবে। আর মেয়েরা কেন করবে?'

'তাও ঠিক।'

'ভাবছি তামান্নাকে নিয়ে একদিন তোমার বাসায় যাব।'

'প্লীজ দয়া করে এই কাজটি করবে না। তোমার কোন কর্মকান্ডের সঙ্গে আমি নিজেকে জড়াতে চাচ্ছি না। এবং আমি খুব খুশী হব যদি তুমি ঐ মেয়েটিকে আর বিভ্রান্ত না কর।'

'তুমি ভুল করছ রূপা। আমি তামান্নাকে মোটেই বিভ্রান্ত করছি না। বরং সেই আমাকে বিভ্রান্ত করছে।'

'হিমু আমি এখন রাখি। আমার কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। আমার শরীর ভাল না, জ্বর। গায়ে র‍্যাশের মত হয়েছে।'

'দেখতে আসব?'

'না। রাখি কেমন?'

রূপা খুব সহজভাবেই টেলিফোন নামিয়ে রাখল।

আমি টেলিফোন রেখে জগলু ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে মধুর ভঙ্গিতে হাসলাম। জগলু ভাই বললেন, হিমু সাহেব কিছু পেমেন্ট করবেন না। আপনার তো মেলা জমে গেল। একটা একটা করে বালি জমে মরুভূমি হয়ে যায়।

আমি আনন্দিত গলায় বললাম, মরুভূমি বলেই মরুদ্যানের খোঁজ থাকে। এক সপ্তাহের মধ্যে সব ক্লিয়ার করে দেব। কুড়ি হাজার টাকা পাচ্ছি।

'চা খাবেন?'

'চা তো খাবই। ভাল কথা, আপনার কর্মচারীদের মধ্যে ইয়াকুব নামে কেউ আছে?'

'জ্বিনা।'

'তাদের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ইয়াকুব নামে কেউ আছে?'

'জানি না, খোঁজ নিয়ে দেখব।'

'ভাল কার খোঁজ নেবেন। আপনার মুখ এমন শুকনো কেন? শরীর ভাল।'

'জ্বি শরীর ভাল।'

'মন খারাপ?'

'হুঁ মন খারাপ। খুবই খারাপ।'

'ব্যবসা হচ্ছে না?'

'না।'

জগলু ভাই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। ক্লান্ত গলায় বললেন, বাবা কিছু ক্যাশ রেখে গিয়েছিল বলে ভেঙ্গে খাচ্ছি। ক্যাশ শেষ হলে কি হবে জানি না। আপনার মত হলুদ পাঞ্জাবী পরে পথে পথে ঘুরতে হবে। ভাগ্য, বুঝলেন হিমু ভাই, সবই ভাগ্য।

জগলু ভাই বিমর্ষমুখে চায়ে চুমুক দিচ্ছেন। জগলু ভাইয়ের দোকানের নাম সুরমা স্টেশনারী। রাস্তার মোড়ে বেশ বড় দোকান। জিনিসপত্র ভালই আছে। দোকানটা দেখতেও সুন্দর। দু'জন কর্মচারী আছে। সুদর্শন, কথাবার্তায় ভদ্র। অথচ এই দোকানে কোন কাস্টমার আসে না। আসলেই আসে না। জগলু ভাই এর আগে কলাবাগানে একটা দোকান দিয়েছিলেন—সাগর স্টোর। সেখানেও একই অবস্থা। আশপাশে সব দোকানে ভাল বিক্রি— সাগর স্টোরে মাছিও উড়ে না যে কর্মচারীরা মাছি মারবে। জগলু ভাই দোকানের জায়গা বদলালেন, নাম বদলালেন। আগে যে কর্মচারী ছিল তাকেও বদলালেন। কোন লাভ হল না। এখানেও এই অবস্থা। সব দোকানে রমরমা ব্যবসা — তারটা ফাঁকা।

'হিমু সাহেব!'

'জ্বি।'

'ভাগ্যটা কেমন জিনিস দেখলেন? আমি সারাদিন চুপচাপ বসে থাকি, চা খাই আর মনে মনে ভাগ্য কি সেটা ভাবি। কেন আমার দোকানে লোক আসবে না? আমি জিনিসের দাম বেশি রাখি না, কাস্টমারের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করি। তারপরেও এই অবস্থা কেন? বড় ধরনের পীর–ফকির পেলে ডেকে জিজ্ঞেস করতাম। আপনার সন্ধানে কোন পীর–ফকির থাকলে নিয়ে আসবেন। উনাদের দোয়াতে যদি কিছু হয়। খরচপাতি যা লাগে আমি দিব। কথাটা মনে রাখবেন হিমু সাহেব।'

'জ্বি মনে রাখব।'

'চা কি আরেক কাপ খাবেন?'

'জ্বি না। আজ উঠি, কাজ আছে।'

'বসেন গল্প করি। চুপচাপ বসে থাকি — কথা বলার মানুষ নাই।'

'আরেক দিন এসে গল্প করব। আমার প্রচুর কাজ —একটা লোকের সন্ধান করছি। নাম ইয়াকুব।'

'শুধু নাম দিয়ে লোক খুঁজে বের করে ফেলবেন? এক কোটি লোক থাকে ঢাকা শহরে।'

আমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, চেষ্টা করে দেখি।

'দুপুরে চলে আসুন। আজ খিচুড়ি রাঁধতে বলেছি। আমার কাজের ছেলেটা ভাত–মাছ রাঁধতে পারে না, খিচুড়ি পোলাও এইসব ভাল রাঁধে।'

'দেখি সময় পেলে চলে আসব।'

আমি আবারো পথে নামলাম। পায়ের ভাঙ্গা নখ কষ্ট দিচ্ছে। মানুষের দু'টা অংশ শরীর এবং মন। মন অনেক কষ্ট সহ্য করতে পারে। শরীর কেন পারে না? শরীরের বয়স বাড়ে। মনের বাড়ে না। জড়া শরীরকে গ্রাস করতে পারে। মনকে পারে না। শরীরের মৃত্যু আছে মনের কি অবস্থা? যে মন জড়াকে জয় করতে পারে সে নিশ্চয়ই মৃত্যুকেও জয় করতে পারে। এই জাতীয় দার্শনিক চিন্তা করতে করতে এগুচ্ছি।

রাস্তায় প্রচুর মানুষ। তাদের ব্যস্ততাও দেখার মত। রাস্তার পাশে চায়ের দোকানে বসে যে চা খাচ্ছে সেও ব্যস্ত। স্থির হয়ে চা খাচ্ছে না, সারাক্ষণ এদিক–ওদিক তাকাচ্ছে। এদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে রহস্যময় ইয়াকুব।

ঢাকা শহরের মানুষদের ঠিকঠাক পরিসংখ্যান থাকলে দেখা যেত এই শহরে মোট কতজন ইয়াকুব আছে। তিন থেকে পাঁচ হাজার থাকার কথা। এদের মধ্যে কেউ কেউ নিশ্চয়ই অসম্ভব বিত্তবান। কেউ হতদরিদ্র। দু'একজন পাওয়া যাবে সাধু সন্ত—মহাপুরুষ পর্যায়ের, কয়েকজন নিশ্চয়ই ভয়ংকর অপরাধী—

খুনটুন করে ফেলেছে। কিছু থাকবে রেপিষ্ট। ন'দশ বছরের বালিকা রেপ করে লুকিয়ে আছে।

ঢাকা শহরের সব ক'টা ইয়াকুবকে একত্র করে একটা গ্রুপ ছবি তুলতে পারলে ভাল হত। এদের নিয়ে গবেষণাধর্মী একটা বইও লেখা যেত —

A comprehensive study in the lives of
Yakub's of
Dhaka city.

বাংলায়—'ঢাকা শহরের ইয়াকুবদের জীবন চর্চা।' না বাংলা নামটা ভাল লাগছে না। গবেষণাধর্মী বইয়ের নাম ইংরেজীতেই ভাল খুলে।

গরম লাগছে। শীতকালের রোদ খুব কড়া হয়। রোদটা জামা–কাপড় ভেদ করে চামড়ার ভেতর ঢুকে পড়ে। রোদ থেকে ছায়াতে গেলেই লাগে ঠান্ডা। শীতকাল হল এমন এক কাল যে কালে রোদেও থাকা যায় না, ছায়াতেও থাকা যায় না।

আমি ভিক্ষুক মেছকান্দর মিয়ার সন্ধানে বের হলাম। আজ সতেরো তারিখ এই খবরটা তাকে জানানো দরকার। বেচারা তারিখ জানতে চাচ্ছিল। যে পাথর আমাকে ব্যথা দিয়েছে তাকেও দেখে আসতে ইচ্ছা করছে। জগৎ অতি রহস্যময়। কে জানে একদিন হয়ত বৈজ্ঞানিকরা বের করে ফেলবেন জড় পদার্থেরও মন আছে। তাদের জীবনেও আছে আনন্দবেদনার কথা। আমার বাবা তার জবেদা খাতায় লিখে গেছেন

"মহাপ্রাণ নানান ভঙ্গিতে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। তিনি মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, পশু কীটপতঙ্গ হিসেবেও নিজেকে প্রকাশ করেছেন। গাছপালাও মহাপ্রাণেরই অংশ। নদী, সাগর, বালি ধূলিকণাতেও তিনি নিজেকে প্রকাশিত করেছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলই মহাপ্রাণের নানান রূপান্তর।"

আমার পিতার কথা সত্যি হলে পাথরেরও প্রাণ থাকবে। যেহেতু সে পাথর তার প্রাণ হবে কোমল। সে মানুষকে ব্যথা দিচ্ছে ঠিকই কিন্তু নিজে সেই কারণে অনেক বেশি কষ্ট পাচ্ছে।



'কে হিমু না?'

আমি থমকে দাঁড়ালাম। পায়ের পাতা গরমে চিড়চিড় করছে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা ভয়াবহ ব্যাপার। শীতকাল এখনো শেষ হয়নি। অথচ দিনের বেলায় চৈত্র মাসের গরম পড়ছে। আলনিনোর এফেক্ট হবে। রাস্তার পিচ এখনো গলা শুরু করেনি। তবে মনে হচ্ছে করবে। ভরদুপুর হলেও কথা ছিল। বেলা চারটার মত বাজে। বিকেল শুরু হয়েছে। এখনো এত গরম।

'কথা বলছিস না কেন? তুই হিমু না?'

আমি বলতে যাচ্ছিলাম— 'জ্বি না। রং নাম্বার।'

বলা হল না। এমন তো হতে পারে যে প্রশ্ন করছে— তাকেই আমি খুঁজছি। তার নামই ইয়াকুব। বাবার নাম সোলায়মান। আমার অনুসন্ধানের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে গড অলমাইটি তাকেই আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি প্রশ্নকর্তার দিকে তাকালাম। প্রশ্নকর্তা মিডিয়াম সাইজ পর্বতের কাছাকাছি। টকটকে লাল শার্ট গায়ে দিয়ে আছেন। তাঁর বিশাল ভুরী শার্ট ছিঁড়ে যে কোন মুহূর্তে বের হয়ে আসবে বলে মনে হচ্ছে। মাথা পরিষ্কার করে কামানো। নেংটি পরিয়ে ছেড়ে দিলে জাপানী সুমো কুস্তিগীর হয়ে যাবে। জাপানীদের সঙ্গে চেহারার খানিকটা মিলও আছে। নাক চ্যাপ্টা। চোখ ছোট ছোট। এর নাম ইয়াকুব হবার কোন কারণ নেই।

প্রশ্নকর্তা আহত গলায় বলল, মাই ডিয়ার ওল্ড ফ্রেণ্ড, তুই কি এখনো আমাকে চিনতে পারছিস না?

আমি বললাম, না এখনো চিনতে পারিনি। তাতে কোন অসুবিধা নেই। তুই আছিস কেমন দোস্ত? শরীরটা তো মাশাল্লাহ্ ভাল বানিয়েছিস।

প্রশ্নকর্তা বিষণ্ন গলায় বলল, কেউ আমাকে চিনতে পারে না। তাদের দোষ দিয়ে কি হবে। আমি নিজেই নিজেকে চিনি না। তোর সঙ্গে কিশোরী মোহন পাঠশালায় পড়তাম। আমি আরিফ। আরিফুল আলম জোয়ার্দার। এখনো চিনতে পারিসনি?

'না।'

'চেনা চেনা কি লাগছে? না তাও লাগছে না?'

'তাও লাগছে না। অবশ্যি শুরুতে ভেবেছিলাম— তুই ইয়াকুব।'

'ইয়াকুব কে?'

'ইয়াকুব হল সোলায়মানের ছেলে।'

'সোলায়মানটা কে?'

'বাদ দে, চিনতে পারবি না। কেমন আছিস বল?'

'দোস্ত সত্যি করে বল তুই এখনো আমাকে চিনতে পারছিস না?'

'না।'

'চিনতে না পারলে এমন আন্তরিকভাবে কথা বলছিস কেন?'

'তুই আন্তরিকভাবে কথা বলছিস দেখে আমিও বলছি।'

আরিফুল আলম জোয়ার্দার গলা নিচু করে বলল, ক্লাস ফোরে পড়ার সময় একদিন বেঞ্চিতে 'ইয়ে' করেছিলাম। যার জন্যে টিফিনের সময় ক্লাস ছুটি হয়ে গেল। অংক স্যার আমাকে ডাকতেন — 'ব্যাঙাচি।'

আমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছি, ব্যাঙাচির এই অবস্থা?

ইউনিভার্সিটির পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে মুখ হাসি হাসি করে জিজ্ঞেস করা হয়— 'তারপর কি খবর ভাল আছেন? এখন কি করছেন?' কলেজের পুরানো বন্ধুর সঙ্গে বলা হয়— 'আরে তুমি? কেমন আছ?' আর স্কুল লেভেলের বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে— একজন আরেকজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে — তাই নিয়ম।

আমি ব্যাঙাচির উপর ঝাঁপ দেব কি দেব না ভাবছি। বেচারা যেভাবে করুণ চোখে তাকিয়ে আছে মনে হচ্ছে আমার ঝাঁপের অপেক্ষা করছে। ঝাঁপ দেয়াই মনস্থ করলাম।

দু'হাতেও তাকে ঠিক জড়িয়ে ধরা গেল না। ব্যাঙাচি ধরা গলায় বলল, দোস্ত গরমের মধ্যে জড়াজড়ি করিস না ছাড়। শরীর ভর্তি চর্বি। জড়াজড়ি করলে অস্বস্তি লাগে।

আমি বললাম, লাগুক অস্বস্তি। তোকে ছাড়ব না। তুই এমন মটু হয়েছিস কি ভাবে?

'খেয়ে খেয়ে মটু হয়েছি দোস্ত। দিন-রাত খাই।'

'বলিস কি?'

'কেন খাব না বল — আল্লাহপাক মানুষকে খাওয়ার জন্যেই তো সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই মানুষের খাদ্যদ্রব্য। গরু-মহিষ, ছাগল-ভেড়া, পোকা-মাকড়, গাছ-গাছড়া সবই তো আমরা খাচ্ছি। খাচ্ছি না?'

'হুঁ খাচ্ছি।'

'আমার এক চাচী ছিলেন পেটে সন্তান এলেই তিনি মাটি খেতেন। মাটির চুলার তিনটা মাথা ভেঙ্গে একদিন খেয়ে ফেললেন। সেদিন রান্না হল না। রাঁধবে কোথায়? চুলা নেই। চাচীর শাশুড়ি চাচীর উপর খুব রাগ করল — বৌমা এতই যদি মাটি খেতে হয়— ক্ষেতে চলে যাও। ক্ষেতে গিয়ে মাটি খাও। আমি চোখের আড়াল হলে তুমি দেখি বাড়িঘর সব খেয়ে ফেলবে। তাদের আবার মাটির ঘর-বাড়ি তো, এই জন্যে চিন্তাটা বেশি।'

আমি হো হো করে হাসছি। বড় হয়ে ব্যাঙাচি যে এমন রসিক হবে তা বোঝা যায়নি। ছোটবেলায় তার প্রতিভা বেঞ্চিতে 'ইয়ে' করে দেবার ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ ছিল।

ব্যাঙাচি ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তোর সঙ্গে দেখা হয়ে ভাল লাগছে রে দোস্ত। তুই যখন জড়িয়ে ধরলি তখন প্রায় কেঁদেই ফেলেছিলাম। দেখা হলে জড়িয়ে ধরার মত বন্ধু মানুষের এক দু'টার বেশি থাকে না। আয় কোথাও বসে চা-টা কিছু খাই। ভাল কথা, চাকরি-বাকরি কিছু করছিস?

'পার্ট টাইম চাকরি।'

'পার্ট টাইম চাকরি ভাল রে দোস্ত। টেনশান কম। কাজটা কি? বেতন কত? বেতন কম হলে বলিস না। তোকে লজ্জা দেবার জন্যে জিজ্ঞেস করিনি। পুরানো বন্ধু সেই দাবিতে জিজ্ঞেস করা।'

'অনুসন্ধানের কাজ। একটা লোককে খুঁজে বের করা। খুঁজে বের করতে পারলে কুড়ি হাজার টাকা পাব। খুঁজে না পেলে লবডঙ্গা।'

'দোস্ত চিন্তা করিস না। আমি তোকে সাহায্য করব। ওয়ার্ড অব অনার। পুরানো বন্ধুর জন্যে এইটুকু না করলে কি হয়। তাছাড়া আমার কাজকর্মও কিছু নেই। আয় কোথাও বসে চা-টা কিছু খাই। ফর ওল্ড টাইম সেক। তোর সঙ্গে টাকা-পয়সা কিছু আছে?'

'না। আমার পাঞ্জাবীর পকেট নেই।'

'এটা ভাল করেছিস। পকেটই ফেলে দিয়েছিস। টাকা আমার কাছেও নেই। বউ টাকা দেয় না। টাকা দিলেই খাওয়া-দাওয়া করব এই জন্যে দেয় না। সে যেমন বুনো ওল আমিও তেমন বাঘা তেতুল। আমিও ব্যাঙাচি —ঢাকা শহরে তিনটা জায়গায় ব্যবস্থা করা আছে। বাকিতে খাই, মাসকাবারি টাকা দেই। চল আমার সঙ্গে একটু হাঁটতে হবে। পারবি না?'

'পারব।'

'তোকে দেখে এমন ভাল লাগছে দোস্ত। আবার খারাপও লাগছে। খালি পায়ে হাঁটছিস দেখে মনে ব্যথা পেয়েছি। আই এ্যাম হার্ট। ভিক্ষা করে যে ফকির সেও স্পঞ্জের স্যান্ডেল পায়ে দেয়। আর তুই হাঁটছিস খালি পায়ে? তুই কোন চিন্তা করিস না — তোকে আমি ভাল এক জোড়া স্যান্ডেল কিনে দেব। প্রমিস্। টাকা থাকলে আজই কিনে দিতাম। জুতার দোকানে বাকি দেয় না।'

ব্যাঙাচি আমাকে নিয়ে মালীবাগের এক কাবাব হাউসে ঢুকল। পিয়া কাবাব এণ্ড বিরানী হাউস। সাইনবোর্ডে রোগা পটকা এক খাসির ছবি। খাসির মুখটা হাসি হাসি। হাস্যমুখী ছাগল যে পেইন্টার এঁকেছে তাকে ধন্যবাদ দিতে হয়। মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণী হাসতে পারে না বলে যে ধারণা প্রচলিত তা যে সম্পূর্ণ ভুল হাস্যমুখী ছাগল দেখে তা বোঝা যায়।

'দোস্ত কি খাবি? যা খেতে ইচ্ছে করে খা। এটা বলতে গেলে আমার নিজেরই দোকান। মালিক আমার ভাগ্নে। আপন না, পাতানো। আপন ভাগ্নের চেয়ে পাতানো ভাগ্নের জোর বেশি তাতো জানিসই। জানিস না? বিরানী খাবি?'

'বিকাল বেলা বিরানী খাব?'

'বাসি বিরানী। এর টেস্ট আলাদা। গরম করে দিবে, নাশতার মত খা। বিরানী যত বাসি হয় তত স্বাদ হয়— ঘি ভেতরে ঢুকে। মাংস নরম হয়। মাংসের প্রত্যেকটা আঁশ আলাদা আলাদা হয়ে যায়। আমার কথা শুনে আজ খেয়ে দেখ। একবার খেলে আর টাটকা পোলাও খেতে পারবি না। শুধু বাসি পোলাও খাবি।'

খাওয়ার মত স্থূল ব্যাপারও যে এত দৃষ্টিনন্দন হতে পারে ভাবিনি। আরিফ খাচ্ছে, আমি মুগ্ধ হয়ে দেখছি। মনে হচ্ছে পোলাওয়ের প্রতিটি দানার স্বাদ সে আলাদা করে পাচ্ছে। হাড্ডি চুষছে। আনন্দে তার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। খাওয়ার মাঝখানে একটা আস্ত পেঁয়াজ নিয়ে কচকচ করে চিবিয়ে ফেলল। গাঢ় স্বরে বলল, পেঁয়াজের রস হজমের সহায়ক। ভরপেট বিরানী খাবার পর দু'টা মিডিয়াম সাইজ পেঁয়াজ চিবিয়ে খেয়ে ফেলবি দেখবি আধ ঘন্টার মধ্যে আবার ক্ষিধে পেয়েছে। আমার অবশ্যি হজমের সমস্যা নেই।

বিরানী পর্ব (তিন প্লেট। আর ছিল না।) শেষ হবার পর এক বাটি স্যুপের মত তরল পদার্থ এল। স্যুপের উপর গুলমরিচের গুঁড়া ভাসছে। কুচিকুচি করে কাটা কাঁচা মরিচ ভাসছে। আরিফ বাটির দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে। স্যুপের বাটির দিকে এমন মুগ্ধ প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে এর আগে কি কেউ তাকিয়েছে? মনে হয় না।

আমি বললাম, জিনিসটা কি?

আরিফ গাঢ় স্বরে বলল, কাচ্চি-রসা।

'কাচ্চি-রসা মানে? এই নাম তো আগে কখনো শুনিনি।'

'শুনবি কি করে? আমার দেয়া নাম —অসাধারণ একটা জিনিস— কাচ্চি বিরিয়ানীর তেল। চুইয়ে চুইয়ে পাতিলের নিচে জমা হয়। হাই প্রোটিন। খেতে অমৃত। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম, সেও এক ইতিহাস। শুনবি?'

'বল শুনি।'

'কিসমত নামে পুরানো ঢাকায় একটা রেস্টুরেন্ট আছে। সেখানে বিরানী খাচ্ছি হঠাৎ দেখি বাবুর্চি পাতিল থেকে তেল নিংড়ে ফেলে দিচ্ছে। আমি ভাবলাম খেয়ে দেখি জিনিসটা কেমন। খারাপ হবার কথা তো না, ঘি প্লাস গোশতের নির্যাস, প্লাস পোলাওয়ের চালের নির্যাস। এক চামচ মুখে দিয়ে বিশ্বাস কর দোস্ত আমার কলজা ঠান্ডা হয়ে গেল। সেই থেকে নিয়মিত খাচ্ছি। চেখে দেখবি একটু?'

না।'

'থাক, রোগা পেটে সহ্য হবে না।'

ব্যাঙাচি গভীর তৃপ্তিতে কাচ্চি-রসার বাটিতে চুমুক দিল। লম্বা চুমুক না, ধীর লয়ের চুমুক। যেন প্রতিটি বিন্দুর স্বাদ আলাদা আলাদাভাবে নিচ্ছে। তার চোখ বন্ধ। মাথা সামান্য দুলছে। যেন কোন সংগীত রসিক বিথোভেনের ফিফথ সিমফনী শুনছে।

আরিফ হঠাৎ চোখ খুলে গোপন কোন সংবাদ দেবার মত করে বলল, মিরপুরে বিহারীদের একটা দোকান আছে। খাসির চাপ বানায়। এমন চাপ বেহেশতের বাবুর্চিও বানাতে পারবে না। তোকে একদিন নিয়ে যাব। আজই নিয়ে যেতাম ওরা আবার বাকিতে দেয় না। কি কি সব মশলা দিয়ে চাপটাকে চার পাঁচ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখে। তারপর ডোবা তেলে ভাজে। মশলার মধ্যেই কারিগরি।

'খাওয়া-দাওয়া ছাড়া অন্য কোন প্রসঙ্গ নিয়ে তুই কথা বলিস না?'

'বলব না কেন? বলি তবে বলতে ভাল লাগে না। খাওয়ার জন্যে মরতে বসেছি। ডাক্তার জবাব দিয়ে দিয়েছে। শরীর ভর্তি চর্বি, হাই ব্লাড প্রেসার, হাই কোলেস্টারল, লিভার ড্যামেজড। ফ্যাটি লিভার। কিডনীর সমস্যা। হয়ত আর বছরখানিক বাঁচব। যার জন্যে মরতে বসলাম তারে নিয়েই কথা বলি। কাচ্চি রসা খেয়েছি—এখন তার এফেক্ট কি হয় দেখ— তাকিয়ে থাক আমার দিকে।'

আমি তাকিয়ে আছি। ব্যাঙাচি ঘামতে শুরু করেছে। ফোঁটা ফোঁটা ঘাম না, বৃষ্টির ধারার মত ঘাম নেমে আসছে। একটা বড় ফ্লোর ফ্যান তার দিকে দিয়ে দেয়া হয়েছে। পাখা ফুল স্পীডে ঘুরছে। ব্যাঙাচি ক্লান্ত গলায় বলল, 'এই রকম ঘাম চলবে আধ ঘন্টার মত। তারপর শরীর নেতিয়ে যাবে। তখন ঘন্টাখানিক

শুয়ে থাকতে হবে। তুই চলে যা—এদের এখানে বিছানা আছে। আমি শুয়ে থাকব।'

'চলে যাব?'

'অবশ্যই চলে যাবি। এই নে কার্ডটা রেখে দে। বাসার ঠিকানা আছে। সন্ধ্যার পর চলে আসিস। তোকে স্যান্ডেল কিনে দেব। আমার হাতে তো এরা টাকা-পয়সা দেয় না। তোর ভাবীকে বলব স্যান্ডেল কিনে দিতে। তুই খালি পায়ে হাঁটছিস দেখে খুবই মনে কষ্ট পেয়েছি। ক্লাসের কত অগা-মগা-বগা কোটিপতি হয়ে গেল আর তুই খালি পায়ে হাঁটাহাঁটি করছিস।'

'তুই কথা বলিস না, চুপ করে থাক। কথা বলতে তোর কষ্ট হচ্ছে।'

'কষ্ট তো হচ্ছেই। তোর কোন কার্ড আছে?'

'না।'

'জিজ্ঞেস করাই ভুল হয়েছে। খালি পায়ে যে হাঁটে তার আবার কার্ড কি। যাই হোক, আমারটা রেখে দে। সন্ধ্যার পর বাসায় চলে আসবি। দারোয়ান ঢুকতে না দিলে কার্ড দেখাবি। স্ট্রেইট আমার কাছে নিয়ে যাবে। দারোয়ানকে বলা আছে। অপরিচিতদের মধ্যে যারা আমার কার্ড দেখাবে শুধু তাকেই ঢুকতে দেবে।'

'তুই কি খুব মালদার পার্টি না-কি?'

'কার্ডটা দেখ। কার্ড দেখলেই বুঝবি। আর দোস্ত শোন, তোকে আমি সাহায্য করব। ওয়ার্ড অব অনার। ঐ লোককে খুঁজে বের করব।'

ব্যাঙাচির ঘাম আরো বেড়ে গেল। তাকে ওই অবস্থায় রেখে আমি চলে এলাম। হাতে ব্যাঙাচির কার্ড। হেন্ডশেকের বদলে কার্ডশেক। কিছুদিন পর কার্ড কালচারের আরো উন্নতি হবে বলে আমার ধারণা। কার্ডে সরকারী বিধিনিষেধ এসে পড়বে। সাধারণ জনগণ ব্যবহার করবে সাদা রঙের কার্ড, সংসদের সদস্যরা লাল পাসপোর্টের মত লাল কার্ড, কোটিপতিদের কার্ড হবে সোনালি, লক্ষপতিদের রূপালী—। ফকির-মিসকিনদের কার্ডের রঙ হবে ছাই রঙের। তাদের কার্ডে প্রয়োজনীয় সব তথ্য থাকবে। যেমন—

মেছকান্দর মিয়া ভিক্ষুক
পিতা ঃ কুতুব আলি
এক চক্ষু বিশিষ্ট (কানা)
ব্যবসায়ের স্থানঃ রামপুরা টিভি ভবন হইতে মৌচাক গোলচত্বর
ট্রেড মার্ক ঃ গোল পাথর
সরকারী রেজিস্ট্রেশন নম্বরঃ ৭১৯৬৩৩০২/ক

সন্ধ্যাবেলা ভিক্ষুক মেছকান্দর মিয়ার অবস্থানের জায়গাটায় গেলাম।

মেছকান্দর আমাকে দেখে বিরক্ত ভঙ্গিতে তাকাল। আমি মধুর গলায় বললাম, 'কেমন আছ মেছকান্দর?'

সে জবাব দিল না। পিচ করে থুথু ফেলল। থুথু পড়ল পাথরটার উপর।

আমি বললাম, 'মেছকান্দর আজ হল ২১ তারিখ। তুমি তারিখ জানতে চাও। কাজেই আমি ঠিক করেছি রোজ এসে তোমাকে তারিখ জানিয়ে যাব।'

মেছকান্দর এক চোখে তাকিয়ে আছে। এক চোখের দৃষ্টি এমনিতেই তীক্ষ্ণ হয়। আজ আরো তীক্ষ্ণ লাগছে। মেছকান্দর বিড়ি বের করে ধরাল। আমি অমায়িক গলায় বললাম, 'আমাকে একটা বিড়ি দাও তো।'

মেছকান্দর বিরক্ত গলায় বলল, 'ক্যান আমারে ত্যাক্ত করতেছেন? আমি আপনের কি ক্ষতি করছি?'

বলতে বলতে সে পাথরের উপর আবার থুথু ফেলল। আমি বললাম, 'পাথরের উপর থুথু ফেলো না। আমি ঠিক করেছি এই পাথরটা আমি আমার এক বন্ধুকে উপহার দেব। সে সর্বভুক। হাতুড়ি দিয়ে পাথর ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে সে খেয়ে ফেলবে। একটু সিরকা দেবে, কিছু লবণ, কিছু গোলমরিচ। পাথরের চাটনি।

মেছকান্দর কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে। তার হাতের বিড়ি নিভে গেছে। কিন্তু চোখে আগুন জ্বলছে। আমি পাথরের উপর বসে পড়লাম। সন্ধ্যা হচ্ছে। পাথরে বসে সন্ধ্যার দৃশ্য দেখতে ভাল লাগার কথা। মেছকান্দরের মুখ ভর্তি থুথু। মনে হচ্ছে পাথরটা সে ব্যবহার করে থুথু ফেলার জন্যে। আমি পাথরে বসে থাকায় সে থুথু ফেলতে পারছে না।



আমি ইয়াকুব সাহেবকে স্বপ্নে দেখলাম। ভদ্রলোকের কেমন মমি মমি চেহারা। তাঁর চোখেও কোন সমস্যা আছে। সারাক্ষণ পিটপিট করে চোখের পাতা ফেলছেন। শবাসনের মত শিরদাঁড়া সোজা করে আমার বিছানায় বসে আছেন। খালি গা, গা বেয়ে ঘাম পড়ছে। অথচ শীতকাল। আমি চাদর গায়েই স্বপ্নের ভেতর কাঁপছি। ইয়াকুব সাহেব মাঝে মাঝে বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। খালি গায়ের কারণে তাঁর পাঁজরের সব হাড় দেখা যাচ্ছে। পাঁজর বের করা বুদ্ধের মূর্তির সঙ্গে কিছু মিল আছে। বুদ্ধদেবের কানের মত বড় বড় কান। টানা টানা চোখ।

আমি বললাম, ইয়াকুব সাহেব না?

তিনি বললেন, জ্বি জনাব। আমার নাম ইয়াকুব।

'আপনাকে ক' দিন ধরেই খুঁজে বেড়াচ্ছি। কেমন আছেন?'

'জ্বি ভাল।'

'ধ্যান করছিলেন নাকি?'

'অনেকটা সে রকমই।'

'সরি, আপনার ধ্যান ভাঙ্গালাম।'

'না, ঠিক আছে।'

'আপনি আসল ইয়াকুব তো? আপনার বাবার নাম কি?'

'বাবার নাম শ্রী সোলায়মান।'

'নামের আগে শ্রী বসাচ্ছেন কেন? আপনি মুসলমান না?'

'জ্বি না। আমাদের মানব ধর্ম।'

'ও আচ্ছা, মানব ধর্ম।'

'মানব ধর্মে নামের আগে শ্রী বসানো যায়, আবার জনাবও বসানো যায়। আপনার যা ভাল লাগে তাই বসাতে পারেন।'

'জানতাম না।'

'ইয়াকুব সাহেব ধ্যানস্ত হয়ে পড়লেন। চোখ বন্ধ। আমি ইতস্তত করে বললাম, ধ্যান করে কিছু পাচ্ছেন?'

'কিছু পাওয়ার জন্যে তো ধ্যান করছি না। মনের শান্তির জন্যে ধ্যান করছি।'

'শান্তি পাচ্ছেন?'

'এখনো পাচ্ছি না, তবে পাব।'

'ইয়াকুব সাহেব!'

'জ্বি।'

'আপনার ঠাণ্ডা লাগছে না?'

'জ্বি একটু লাগছে।'

'আমার চাদরটা কি আপনার গায়ে জড়িয়ে দেব?'

'দিতে পারেন। তবে আপনার তো ঠাণ্ডা লাগবে।'

'ঠাণ্ডায় আমার কষ্ট হয় না। ঠাণ্ডা সহ্য করার মন্ত্র আমাকে আমার বাবা শিখিয়ে গেছেন।'

'মন্ত্রটা কি?'

'আপনাকে বলা যাবে না। গুরুমুখী গুপ্ত বিদ্যা। আপনাকে বললেই বিদ্যা চলে যাবে।'

'তাহলে বলার দরকার নেই। চাদরটা গায়ে জড়িয়ে দিন। ভাল ঠাণ্ডা পড়েছে।'

'এত ঠাণ্ডা জানলে খালি গায়ে ধ্যানে বসতাম না। মিসটেক হয়ে গেছে।'

আমি ইয়াকুব সাহেবের গায়ে চাদর জড়িয়ে দিলাম। স্বপ্নের মধ্যেই শীতে আমার নিজের শরীর জমে গেল এবং আমি জেগে উঠে দেখি গায়ের লেপ মেঝেতে পড়ে আছে। আমি ঠকঠক করে কাঁপছি। এ বছর আবহাওয়ার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। ক' দিন আগেই গরম ছিল — এখন আবার শীত নেমে গেছে। ভয়াবহ শীত। শৈত্য প্রবাহ চলছে। খবরের কাগজ বলছে এক সপ্তাহ থাকবে। নেতাদের খুব সুবিধা হয়েছে। করুণ মুখ করে — সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনেলে, গাবতলীতে, কমলাপুর রেল স্টেশনে শীতের কাপড় বিলি করতে পারছেন। সেই ছবি টিভিতে দেখানো হচ্ছে। পত্রিকায় সচিত্র সংবাদ ছাপা হচ্ছে। ছবির ক্যাপশান—

শীতার্ত মায়ের মুখে হাসি

দেখা যাচ্ছে মা একজন খালি গায়ের শিশুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মা এবং শিশু দু' জনের মুখ ভর্তি হাসি। দু' জনই কম্বলের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে।

সবাই খুশি। নেতা খুশি তিনি কম্বল দেয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। মা এবং শিশু খুশি তারা কম্বল পাচ্ছে। ফটোগ্রাফার খুশি দারুণ একটা ছবি তোলা গেল।

মেঝে থেকে লেপ তুলতে গিয়ে আমি ছোটখাট একটা শকের মত পেলাম। আমার ঘরে বাইশ-তেইশ বছরের একটা মেয়ে। পায়ের কাছের চেয়ারে চুপচাপ বসে আছে। মেয়েটা প্রিন্টের একটা শাড়ি পরেছে। শীতের জন্যে মাথায় স্কার্ফ বাঁধা। মেয়েটিকে সুন্দর দেখাচ্ছে বললে ভুল হবে— অপূর্ব লাগছে বললেও কম বলা হয়। স্বপ্ন দৃশ্যের মেয়েরাই এত সুন্দর হয়। একটু আগে স্বপ্নে ইয়াকুবকে দেখেছি— এই মেয়েটিকেও স্বপ্ন দেখছি না তো। আজ বোধহয় আমার স্বপ্ন দেখার দিন। না স্বপ্ন না, মেয়েটির গা থেকে সেন্টের গন্ধ আসছে। স্বপ্ন দৃশ্যে গন্ধ থাকে না। মেয়েটার চোখ ভর্তি বিস্ময়। ঠোঁট চেপে সে হাসছে। ঘুমের মধ্যে আমি হাস্যকর কোন কাণ্ড করেছি কি-না কে জানে।

শান্ত চেহারার মেয়ে। নিশ্চয়ই কোন বাড়ির বড় মেয়ে, যার অনেকগুলি ছোট ছোট ভাই-বোন আছে। ভাই-বোনগুলি দুষ্টু। এদের সবাইকে সামলে-সুমলে রাখতে হয়। এ ধরনের বাড়ির বড় মেয়েদের চেহারা এ রকম হয়। এরা মেয়ে হিসেবে খুবই ভাল, শুধু সমস্যা একটাই — এরা সবাইকে ছোট ভাই-বোনের মত দেখে।

আমার যদি ঘুম ভেঙ্গে না যেত আমি নিশ্চিত সে মেঝে থেকে লেপ তুলে আমার গায়ে দিয়ে দিত। মাথার নিচের বালিশ ঠিকঠাক করে দিত। আমি দ্রুত চিন্তা করার চেষ্টা করছি— মেয়েটা কে হতে পারে? নিশ্চয়ই আমার পরিচিত। পরিচিত না হলে ঘরে ঢুকবে না। দরজা খোলা থাকলেও উঁকি দিয়ে দেখেই দরজায় টোকা দেবে। ঘরের বাইরে থেকে সাড়াশব্দ করে ঘুম ভাঙ্গাবার চেষ্টা করবে। মেয়েদের সম্পর্কে সবার ধারণা তারা খুব ধৈর্যশীলা। আসলে তা না। মেয়েরা ধৈর্য ধরে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারে না। বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছেলেরা যেখানে দু' তিনবার কলিং বেল টিপবে— মেয়েরা সেখানে কলিং বেল টিপে যেতেই থাকবে।

মেয়েটি হাসিমুখে বলল, আপনি বোধহয় আমাকে দেখে খুবই বিস্মিত হচ্ছেন। ভাবছেন কে-না কে? অভদ্রের মত ঘুমন্ত মানুষের ঘরে বসে আছে।

আমি লেপ দিয়ে গা ঢাকতে ঢাকতে বললাম, আমি মোটেই বিস্মিত হচ্ছি না। আপনাকে দেখে ভাল লাগছে।

'অপরিচিত একজন মানুষ ঘরে ঢুকে বসে আছে, তারপরেও বিস্মিত হচ্ছেন না?'

'না। কারণ আপনি মোটেই অপরিচিত নন— আপনি হলেন তামান্না। ফাতেমা খালার পি.এ.।'

মেয়েটা নিজেই এবার বিস্মিত হয়ে বলল, 'বুঝলেন কি করে?'

'আমার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে। সেই ক্ষমতা দিয়ে টের পাচ্ছি। খালা আপনাকে আমার অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে কিছু বলেনি?'

'বলেছেন।'

'আপনি বিশ্বাস করেননি?'

'জ্বি–না।'

'এখন কি করছেন?'

'এখনো করছি না। আপনি অনুমান করে বলেছেন আমি তামান্না। এমন কোন জটিল অনুমানও না। সহজ অংক। দুই দুই–এ চার।'

'ঠিক বলেছেন। আমার নিজেরো ধারণা আমার কোন ক্ষমতা নেই। তবে অনেকের ধারণা খুব প্রবলভাবেই আছে। আপনার ম্যাডাম অর্থাৎ ফাতেমা খালা তাদের মধ্যে একজন।'

'আমি ম্যাডামের একটা চিঠি নিয়ে এসেছি।'

'আপনাকে পাঠালো কেন? খালার টাই পরা ম্যানেজার কোথায়, বুলবুল ভাইয়া?'

'উনি আছেন। তারপরেও আমাকে পাঠিয়েছেন। নিশ্চয়ই কোন একটা উদ্দেশ্য আছে। যাই হোক, এই নিন চিঠি। আপনি চিঠি পড়ুন, আমি চললাম।'

'চিঠি শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসুন। হয়ত চিঠিতে জরুরী কিছু আছে। আপনাকে দিয়েই জবাব পাঠাতে হবে।'

'আচ্ছা আপনি চিঠি পড়ুন, আমি বসছি। আপনি কি দরজা খোলা রেখে ঘুমান? চোর ঢুকে না?'

'ঢুকে। আমার ঘরের জিনিসপত্র দেখে লজ্জা পেয়ে চলে যায়। চোরদেরও কিন্তু চক্ষু লজ্জা আছে।'

'ঘর খোলা রেখে ঘুমান কেন? চোরদের লজ্জা দেবার জন্যে?'

'তা না। আমার বাবা আমাকে খোলা মাঠে ঘুমুতে বলেছেন। খোলা মাঠের বিকল্প হিসেবে খোলা ঘর।'

আমি চিঠি পড়া শুরু করেছি। তামান্না আড়চোখে আমাকে দেখছে। মনে হচ্ছে আমার চিঠি পড়া দেখে সে মজা পাচ্ছে। খালা তাঁর দুর্বোধ্য হাতের লেখায় লিখেছেন—

হিমু,

তুই যে গেলি আর তো দেখা নেই। একদিন শুধু টেলিফোনে হড়বড় করে কিসব বললি। মাথার যন্ত্রণায় সব বুঝতেও পারলাম না। ইয়াকুবকে খোঁজার ব্যাপারে কি করছিস আমাকে জানাবি না? না–কি ভুলেই গেছিস যে,

তোকে একটা দায়িত্ব দিয়েছি? তোর চশমা, চাদর, নতুন পাঞ্জাবী সব তো ফেলে গেলি।

ঐদিন একটা ভুলও করেছি — ইয়াকুবকে খুঁজে বের করার জন্যে তোকে কিছু খরচ দেব বলে ভেবে রেখেছিলাম। সেদিন যাবার সময় তুই এমন তাড়াহুড়া শুরু করলি যে খরচ দেবার কথাটাই মাথা থেকে দূর হয়ে গেল।

তুই রবি সোম এই দু'দিন বাদ দিয়ে যে কোন একদিন চলে আয়। ম্যানেজারকে না পাঠিয়ে ইচ্ছে করে তামান্নাকে পাঠালাম। যাতে তোর সঙ্গে পরিচয় হয়। কৌশলটা ভাল করিনি? মেয়েটাকে নিশ্চয়ই তোর পছন্দ হয়েছে। পছন্দ হবার মতই মেয়ে। দেখতেও খুব সুন্দর তাই না? রঙটা শুধু যদি আর এক পোছ সাদা হত তাহলে আর চোখ ফেরানো যেত না। মেয়েটা যে এত সুন্দর এটা তোকে ইচ্ছে করেই আগে জানাইনি। বরং ইচ্ছা করে বলেছি মেয়েটা ডাউন টাইপ। আগে জানিয়ে রাখলে তুই কল্পনায় উর্বশী বা মেনকা ভেবে রাখতি। তখন আর তামান্নাকে এখন যত সুন্দর লাগছে তত সুন্দর লাগত না।

হিমু, তোকে আল্লার দোহাই লাগে তুই এমন কিছু করিস না যেন মেয়েটা চিরদিনের জন্যে তোর প্রতি বিরূপ হয়ে যায়। তোর আচার–আচরণ, কথাবার্তা কিছুই ভাল না। তোর টাইপের ছেলেদের কাছ থেকে মেয়েরা একশ হাত দূরে থাকে। কাজেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও মেয়েরা যেসব আচরণ পছন্দ করে সে রকম আচরণ করবি।

আমি রিডার্স ডাইজেস্টে পড়েছি মেয়েরা এটেনশান খুব পছন্দ করে। তুই এমন ভাব করবি যেন তামান্নার ধারণা হয় তুই তার দিকে খুব এটেনশান দিচ্ছিস। তোর ফাজলামি ধরনের রসিকতাগুলি অবশ্যই করবি না। মেয়েরা রসিকতা পছন্দ করে না। এটাও রিডার্স ডাইজেস্টে পড়েছি। মেয়েরা সিরিয়াস টাইপ পুরুষ পছন্দ করে। যারা রসিকতা করে মেয়েরা তাকে ছ্যাবলা ভাবে।

আমি যা বলছি তোর ভালর জন্যেই বলছি। তোর খালু তোকে খুব পছন্দ করতো। এই জন্যেই তোর জন্যে আমার কিছু করতে ইচ্ছে করে, যদিও খুব ভাল করেই জানি যে মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে হবে তার জীবনটা ছারখার হয়ে যাবে।

তুই ভাল থাকিস। ইয়াকুবের ব্যাপারটা মনে রাখবি। আমি খুব টেনশানে আছি। ঐ ব্যাটার কথা ভাবতে ভাবতে আমার পেটে গ্যাস হচ্ছে। গ্যাসের চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে যাব। সিঙ্গাপুরে আমেরিকান হসপিটালটা নাকি খুব ভাল। আরেকটা হসপিটাল আছে এলিজাবেথ

হসপিটাল। দু'টার একটায় যাব। এখনো ফাইনাল করিনি। আচ্ছা হিমু শোন, তুই কি আমার সঙ্গে যাবি? তুই তো দেশের বাইরে কখনো যাসনি। এই ফাঁকে বিদেশ দেখা হল। আমি ঠিক করে রেখেছি তামান্নাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। তুই যদি সঙ্গে থাকিস তাহলে ভালই হয়, মাঝে মধ্যে তামান্নাকে নিয়ে শপিংএ গেলি। বা দু'জনে মিলে ছবি দেখলি। এইভাবেও মেয়েটার সঙ্গে তোর ভাব হতে পারে। যাই হোক, অনেক কথা লিখে ফেললাম। ভাল থাকিস।

তোর ফাতেমা খালা।

চিঠি শেষ করে আমি তামান্নার দিকে তাকালাম। সে আগের মতই মিটি মিটি করে হাসছে। এখন মাথা থেকে স্কার্ফ খুলে ফেলেছে। স্কার্ফ খোলার জন্যে তাকে আরো সুন্দর লাগছে। তার মাথা ভর্তি ফুলানো-ফাপানো চুল। তামান্না যদি ছেলে হত তাহলে নাপিতরা তার চুল কেটে খুব মজা পেত। গোছা গোছা চুল কাটা হবে। শব্দ হবে কচকচ কচকচ।

আমি বললাম, 'আপনি চিঠিটা পড়েছেন তাই না?'

তামান্না হকচকিয়ে গিয়ে বলল, 'জ্বি। দয়া করে ম্যাডামকে কিছু বলবেন না। ম্যাডাম বিশ্বাস করে এই চিঠি আমার হাতে পাঠিয়েছেন। আমি বিশ্বাসভঙ্গের কারণ হয়েছি।'

'পড়লেন কেন?'

'ম্যাডামের সব চিঠিপত্র আসলে আমি লিখে দেই। উনি শুধু সই করেন। এই চিঠিটা উনি নিজে অনেক সময় নিয়ে লিখলেন। নিজেই খামে মুখ বন্ধ করলেন। খামের মুখ ঠিকমত বন্ধ হয়েছে কি-না নানানভাবে পরীক্ষা করলেন। এতে আমার কৌতূহল খুব বেড়ে গেল। এবং কি জন্যে জানি আমি পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে গেলাম চিঠিটায় আমার প্রসঙ্গে লেখা আছে। সেই কারণেই খুলে পড়েছি। আমার মস্ত বড় ভুল হয়েছে। আমি খুবই লজ্জিত।'

'চা খাবেন?'

'জ্বি না, চা খাব না।'

'কফি খাবেন?'

তামান্না তাকিয়ে রইল। আমি বললাম, 'খালা আপনার প্রতি এটেনশান দিতে বলেছেন এই জন্যেই চা-কফির কথা জিজ্ঞেস করছি।'

'জ্বি না, কফিও খাব না।'

'ঠাণ্ডা কিছু? পেপসি বা কোক কিংবা লাচ্ছি?'

তামান্না হেসে ফেলল। শব্দ করে হাসি। হেসেই বোধহয় তার মনে হল হাসা ঠিক হয়নি। সে গম্ভীর হতে চেষ্টা করল। মানুষের চরিত্রে তরল ভাব চলে

এলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে কঠিন করা সহজসাধ্য না। মেয়েটা গম্ভীর হতে চেষ্টা করছে, পারছে না। আমি বললাম, 'আপনি বসুন আমি হাতমুখ ধুয়ে আসি। তারপর চলুন বোটানিকেল গার্ডেন দেখে আসি। না-কি চন্দ্রিমা উদ্যানে যেতে চান? বিবাহপূর্ব প্রেমের জন্যে চন্দ্রিমা উদ্যান ভাল।'

তামান্না আবারো হেসে উঠল। মেয়েটা ভাল হাসতে পারে। কিংবা এও হতে পারে যে, সে যে পরিবেশে বাস করে সেখানে হাসার সুযোগ তেমন নেই। অনেকদিন পর মন খুলে হাসতে পারছে।

তামান্না এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি বললাম, 'চা দিতে বলি চা খান?'

'জ্বি আচ্ছা।'

'তিন মিনিট চোখ বন্ধ করে থাকতে পারবেন?'

তামান্না অবাক হয়ে বলল, 'চোখ বন্ধ করতে হবে কেন?'

'আমি খালি গায়ে লেপের ভেতর বসে আছি। চোখটা বন্ধ করলে লেপটা ফেলে দিয়ে শার্ট গায়ে দিতে পারি। সুন্দরী একটা মেয়ের সামনে খালি গা হওয়া অসম্ভব ব্যাপার।'

'আমি আজ চলে যাই, আরেকদিন এসে চা খাব।'

'আচ্ছা ঠিক আছে।'

তামান্না উঠে দাঁড়াল। মাথায় স্কার্ফ পরল। আবার বসে পড়ল। সে মনে হয় গুরুত্বপূর্ণ কোন কথা বলবে। সিরিয়াস ধরনের কোন কথা। ছেলেরা হুটহাট করে সিরিয়াস কথা বলে ফেলতে পারে। মেয়েরা পারে না। তাদের সিরিয়াস কথা বলার জন্যে সামান্য হলেও আয়োজন লাগে। তামান্না সেই আয়োজন করছে। কি বলবে তা আমি মনে হচ্ছে আন্দাজ করতে পারছি।

'হিমু সাহেব।'

'জ্বি।'

'ম্যাডাম আপনার সম্পর্কে আমাকে অনেক ভাল ভাল কথা বলেছেন। আমি ম্যাডামের কথা যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছি। ধরে নিচ্ছি উনি সত্যি কথাই বলছেন। কিন্তু....'

'আমাকে বিয়ে করা আপনার পক্ষে সম্ভব না, তাই তো?'

'জ্বি।'

'আমাকে বিয়ে দেবার দায়িত্ব ম্যাডামকে দেয়া হয়নি। উনি আগবাড়িয়ে সেই দায়িত্ব কেন নিতে চাচ্ছেন তাও জানি না। বিয়ে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত একটা ব্যাপার। উনি কেন আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাবেন?'

'আমি কি খালাকে নিষেধ করে দেব?'

'না। ম্যাডাম বিরক্ত হবেন। আমি কিছুতেই ম্যাডামকে বিরক্ত করতে চাই না। উনার মতের বাইরে গেলেই আমার চাকরি চলে যাবে। ভাই-বোন নিয়ে আমি পথে বসব। কি যে করব কিছু বুঝতে পারছি না।'

'আমি একটা পরামর্শ দেই?'

'দিন।'

'মনে করুন আপনি হাওড়ের মাঝখানে নৌকা নিয়ে আছেন। দুর্ঘটনায় আপনার হাত থেকে বৈঠা পড়ে গেছে। আপনার নৌকায় পাল ছাড়া কিছু নেই। এই অবস্থায় আপনার প্রধান কর্তব্য হচ্ছে হাওড় পাড়ি দেয়া। কোথায় গিয়ে ঠেকবে সেটা বড় কথা নয়। হাওড় পাড়ি দেয়া বড় কথা। কাজেই আপনাকে যে দিকে হাওয়া সেদিকে পাল দিতে হবে। আপনার ম্যাডাম হচ্ছেন হাওয়া, হাওয়া যেদিকে বইছে সেই দিকে পাল তুলে দিন।'

'আপনাকে বিয়ে করতে বলছেন?'

'তা বলছি না। খালার সব কথায় সায় দিয়ে শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যাবেন। বিয়ের পিঁড়িতে বসে হঠাৎ বলবেন—একটু বাথরুমে যেতে হবে। এই বলে পগার পার।'

'রসিকতা করছেন?'

'মোটেই রসিকতা করছি না। বিয়ে নিয়ে একটা পাতানো খেলা খেলতে আমি রাজি আছি।'

তামান্না উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'আপনাকে কোন কিছুতে রাজিও হতে হবে না, অরাজিও হতে হবে না। আমি যথেষ্ট বুদ্ধিমতী একটা মেয়ে। আমার সমস্যার সমাধান সবসময় আমি নিজে করেছি, এখনো তাই করব।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'আপনি শুধু দয়া করে এখন আপনার সঙ্গে যেসব কথা হল তা খালাকে বলবেন না।'

'জ্বি আচ্ছা।'

তামান্না ক্লান্ত ভঙ্গিতে চলে গেল। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম মেয়েটার উপর রাগ হচ্ছে।

অথচ রাগ লাগার তো কোন কারণ নেই। আমার অবচেতন মন কি চাচ্ছিল—এই মেয়েটির সঙ্গে আমার ভাব হোক? হাসিঠাট্টা করে বললেও কি মনের একটি অংশ সত্যি সত্যি চাচ্ছে যে তাকে নিয়ে আমি চন্দ্রিমা উদ্যানে হাঁটতে বের হই।

আমার বাবা তার পুত্রের জন্যে লিখিতভাবে যে উপদেশমালা রেখে গেছেন সেখানে বারবার আমাকে একটি ব্যাপারেই সাবধান করা হয়েছে—

বাবা হিমালয়,

হিন্দু নারী সম্পর্কে একটি বহুল প্রচলিত লোক-শ্লোক আছে—

"পুড়ল কন্যা
উড়ল ছাই
তবেই কন্যার
গুণ গাই।"

অর্থাৎ কন্যার দাহকার্য সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তার গুণকীর্তন করা যাবে না। মৃত্যুর আগমুহূর্তেও তার পা পিছলাতে পারে। সে ধরা দিতে পারে প্রলোভনের ফাঁদে। পা রাখতে পারে চোরাবালিতে।

এটা শুধু হিন্দু মেয়ে না, সবার জন্যে প্রযোজ্য। এবং তোমার জন্যে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। মায়া যখন হাতছানি দিবে তখন তোমাকে রক্ষা করার জন্যে কেউ থাকবে না। মায়াকে মায়া বলে চিনতে হবে। এই চেনাই আসল চেনা।

প্রসঙ্গক্রমে তোমাকে আরেকটি শ্লোক বলি। শ্লোকটি রচনা করেছেন চাক মুনির পুত্র। তাঁর জন্মস্থান তক্ষশিলা। তিনি ছিলেন মহারাজা চন্দ্রগুপ্তের পরামর্শদাতা। যাই হোক, শ্লোকটা এ রকম—

"আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনানি
সমানি চৈতাদি নৃনাং পশুনাম।
জ্ঞানী নরানামধিকো বিশেষ্যে।"

আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন পশু এবং মানুষদের ভেতর সমভাবেই বিদ্যমান। কিন্তু মানুষ জ্ঞানী— আর এখানেই তার বিশিষ্টতা।

চানক্যের এই শ্লোক সব মানুষের জন্যে প্রযোজ্য কিন্তু তোমার জন্যে নয়। পশু এবং মানুষের ভেতর যা সমভাবে বিদ্যমান তোমাকে তা থেকে আলাদা করার চেষ্টা আমি করেছি। কতটুকু সফল হয়েছি আমি জানি না। তবে আমার ধারণা— আমার সারাজীবনের সাধনা বিফলে যাবে না। তুমি সন্ধান পাবে পরম আরাধ্যের।

আমার নিজের ধারণা বাবার সাধনা বিফলেই গেছে। তাঁর পুত্র বর্তমানে পরম আরাধ্যের সন্ধান করছে না। সন্ধান করছে— ইয়াকুবের।

আমি হাত-মুখ ধুতে গেলাম। আজ অনেকগুলি কাজ করতে হবে। ব্যাঙাচিকে খুঁজে বের করতে হবে। ব্যাঙাচিকে নিয়ে শুরু হবে অভিযান—

In search of Yakub.

যে কোন অনুসন্ধানেই দু'জন থাকলে ভাল হয়। হিমালয়ে হিলারী একা উঠেননি, সঙ্গে ছিল তেনজিং।

দরজায় টকটক শব্দ হচ্ছে। তামান্না ফিরে এল না-কি? আমি আগ্রহ নিয়ে বললাম, 'কে?'

ছক্কু গলা বের করল। সে কোকের বোতল ভর্তি করে চা নিয়ে এসেছে। সিগন্যাল না দিতেই চা নিয়ে এল ব্যাপার কি?

'কি খবর ছক্কু?'

'জ্বে খবর ভাল।'

ছক্কু চায়ের বোতল নামিয়ে রাখল। পরোটা ভাজির বাটি সাজাতে বসল। আজ দেখি পরোটা ভাজির সঙ্গে ডিমের ওমলেট উঁকি দিচ্ছে। এইখানেই শেষ না। আরেকটা বাটিতে ঝোল জাতীয় কিছু। সেখানে মুরগির ডানার হাড় ডুব দিয়ে আছে। আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'ব্যাপার কিরে?'

'ব্যাপার কিছু না।'

'তুই দেখি রাজাবাদশার খাবার নিয়ে এসেছিস। করেছিস কি? দু'টাকা হল আমার নাশতার বাজেট। পরোটা ভাজি রেখে বাকি সব ফিরিয়ে নিয়ে যা।'

ছক্কু লজ্জিত মুখে বলল, 'খান। আইজের খানা ফিরি।'

'ফিরি কেন?'

'আইজ আমি খাওয়াইতেছি।'

'ভাল। ঝোলের মত ঐ জিনিসটা কি?'

'ছুপ। মুরগির ছুপ।'

হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসলাম। পরোটা ছিঁড়ে মুরগির 'ছুপে' ভিজিয়ে খাচ্ছি। ছক্কু আনন্দিত চোখে আমাকে দেখছে। পরোটাগুলি আগুন গরম। ছুপ জিনিসটা দেখতে কুৎসিত হলেও খেতে ভাল। আমি তৃপ্তি করে খেলাম। খাওয়া শেষ করে বললাম, 'খেয়ে আরাম পেয়েছিরে ছক্কু। এখন বল কি চাস? ঝটপট বলতে হবে। যা চাইবি তাই পাবি। কি চাস তুই?'

ছক্কু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। কিছু বলতে পারছে না। আমি চায়ের কাপে চা ঢালতে ঢালতে বললাম, 'আশ্চর্য এ রকম একটা সুযোগ মিস করলি। মুখ ফুটে কিছু চাইতে পারলি না।'

ছক্কু মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে আছে। সম্ভবত তার ধারণা হয়েছে সে বিরাট সুযোগ হেলায় হারিয়েছে।

'তোর কিছু চাইবার নেই?'

'আছে।'

'সেটা কি?'

'একটা দোকান দিতে ইচ্ছা করে।'

'চায়ের দোকান?'

'জ্বি না ইষ্টিশন দোকান।'

'স্টেশনারী দোকান?'

'জ্বে। নানান পদের বাজে মাল থাকব।'

'ভুল করলি, তোরে ব্যাটা যখন চাইবার তখন চাইলি না।'

'এমন সুযোগ আর আসব না?'

'সুযোগ তো বার বার আসে না। হঠাৎ হঠাৎ আসে—'

মনে হচ্ছে সে কেঁদে ফেলবে। কাঁদুক। মানুষ হয়ে যখন জন্মেছে তখন কাঁদতে তো হবেই।



মেসের ম্যানেজার খবর পাঠিয়েছে — রুলটানা কাগজে পেনসিলে লেখা — মোটা এক আদমী দেখা করতে এসেছে। সিঁড়ি ভেঙ্গে দোতলায় উঠবে না। তার ঘরে বসে আছে। লোকটাকে ভাল মনে হচ্ছে না। এখন কি করণীয়?

আমি নিচে নেমে দেখি ব্যাঙাচি। গভীর মনোযোগে বাসি খবরের কাগজ পড়ছে। ব্যাঙাচিকে আজ আরো মোটা লাগছে। তার গায়ের শার্টটা জমকাল। লাল নীল ফুল লতা পাতা সাপ খোপ আঁকা। সাহেবরা হাওয়াই দ্বীপ বেড়াতে গেলে এ রকম শার্ট পরে। তাদের বগলে থাকে রোগা পটকা মেয়ে। যে সাহেব যত মোটা তার বগলের তরুণী ততই রোগা। রোগা পটকাদের এ রকম শার্ট মানায় না।

ব্যাঙাচি আমাকে দেখে মুখ ভর্তি করে হাসল। আমি বললাম, নাশতা খেয়ে বের হয়েছিস?

হুঁ।'

'কি নাশতা? পরোটা ক'টা ছিল?'

'পরোটা না আটার রুটি। দেড় পিস রুটি।'

'বলিস কি? রুটির সঙ্গে কি?'

'পেঁপে ভাজি। আধা কাপ কমলার রস।'

'ব্যাস আর কিছু না?'

'দোস্ত আর কিছু না। তোর ভাবী আমাকে খেতে দেয় না। তার ধারণা খেতে না দিলে আমি বোধহয় আগের মত হয়ে যাব।'

'না খেলেও তুই ফুলতে থাকবি?'

'অবশ্যই। এখন একবার ওজন নে। না খাইয়ে সাতদিন একটা ঘরে বন্দি করে রাখ। সাত দিন পর ওজন নে, দেখবি ওয়েট এগারো কেজি বেড়েছে।'

'সর্বনাশ!'

'সারাক্ষণ পেটে ক্ষুধা নিয়ে ঘুরি, দোস্ত। ক্ষুধা কমে না। আমার জীবনের একটা শখ কি জানিস দোস্ত। একটাই শখ মনের তৃপ্তিতে একবেলা খাব। ক্ষিধে



না মেটা পর্যন্ত খেয়েই যাব। মানুষের নানা রকম ভাল ভাল স্বপ্ন থাকে—আমার এই একটাই স্বপ্ন। জানি না স্বপ্ন সত্যি হবে কিনা।'

'ইনশাল্লাহ হবে।'

'তুই যদি কুড়ি হাজার টাকা পেয়ে যাস তাহলে ভালমত একবেলা খাওয়াবি।'

'অবশ্যই খাওয়াব।'

'প্রমিজ করছিস তো?'

'হ্যাঁ, প্রমিজ।'

'তোকে আমি সাহায্য করব। জান দিয়ে সাহায্য করব। ঐ লোকটাকে খুঁজে বার করব। পথেঘাটে খুঁজলে হবে না। সিস্টেমেটিক্যালি খুঁজতে হবে। প্ল্যান করে এগুতে হবে।'

'আয় প্ল্যানটা করি?'

ব্যাঙাচি চোখমুখ উজ্জ্বল করে বলল, 'চল, কোন একটা রেস্টুরেন্টে বসে প্ল্যান করি। তোর চেনা-জানা কোন রেস্টুরেন্ট আছে যেখানে বাকি দেবে?'

আমি বললাম, 'তোর ঐ রেস্টুরেন্টে যাই— কাচ্চি রসা যেখানে খাস?'

ব্যাঙাচি মুখ করুণ করে বলল, 'ঐ রেস্টুরেন্ট দুপুরের আগে খুলবে না। পাঁচশ টাকার একটা নোট পকেটে নিয়ে বের হয়েছিলাম—আরাম করে নাশতা করব। তোর ভাবী পকেট সার্চ করে নিয়ে নিয়েছে। পকেটে স্কচ টেপ মারা এক টাকার একটা নোটও নেই। মাঝে মাঝে মনের দুঃখে ভাবি কাক হয়ে কেন জন্মালাম না।'

'কাক হয়ে জন্মালে লাভটা কি হত?'

'মনের সুখে ময়লা খেতাম। ঢাকা শহরে আর যাই হোক ময়লার অভাব নেই।'

ব্যাঙাচি ফুস করে নিঃশ্বাস ফেলল। আমি তাকে নিয়ে গেলাম বিসমিল্লাহ্ রেস্টুরেন্টে। রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার জোবেদ আলি কোন কারণ ছাড়াই আমার ভক্ত। সে চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এল। আমি বললাম, জোবেদ আলি সাহেব, গরম গরম পরোটা ভেজে আমার বন্ধুর প্লেটে ফেলতে থাকবেন। পরোটার সঙ্গে কি আছে? পেঁপে ভাজি বাদ দিয়ে যা আছে সবই দিন। যেটা ভাল লাগবে সেটা বেশি করে নেবে।

রেস্টুরেন্টে মোটামুটি একটা হুড়াহুড়ি পড়ে গেল। ছক্কুর ডিউটি পড়ল আমাদের খাওয়ানো। ব্যাঙাচি আমার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ গলায় বলল, 'দোস্ত, তুই তো সাধারণ মানব না। মহামানব। আমি খুশি হয়েছি। যা প্রমিজ করলাম—

তোর ঐ লোক না পাওয়া পর্যন্ত আমি দাড়ি-গোঁফ ফেলব না। যদি দাড়ি-গোঁফ ফেলি তাহলে আমি বাপের ঘরের না। আমি বেজন্মা।'

আমি আবারো মুগ্ধ হয়ে ব্যাঙাচির খাওয়া দেখছি। শুধু আমি না, ছক্কু এবং জোবেদ আলিও মুগ্ধ। এত তৃপ্তি নিয়ে যে কেউ খেতে পারে তাই আমার ধারণা ছিল না। মনে হচ্ছে খাওয়ার ব্যাপারটাকে সে উপাসনার পর্যায়ে নিয়ে এসেছে।

'দোস্ত!'

'খাওয়া শেষ করে তারপর কথা বল।'

'খেতে খেতেই বলি। খাওয়া শেষ হতে দেরি হবে। তোর ঐ লোক আগে কোথায় থাকত বললি?'

'অতীশ দীপংকর রোড।'

'তাহলে আমাদের অনুসন্ধানের সেন্টার হবে অতীশ দীপংকর রোড। ঐ লোক অতীশ দীপংকর রোডের আশপাশেই আছে।'

'বুঝলি কি করে?'

'বাড়ি ভাড়া করে যারা বাস করে তারা বাড়ি বদলালেও সেই অঞ্চলেই থাকে, দূরে যায় না। যে ঝিকাতলায় থাকে সে কখনো বাড়ি বদলে কলাবাগানে যাবে না। ঝিকাতলার আশপাশেই ঘুরঘুর করবে।'

'যুক্তি ভাল।'

'আমাদের খোঁজ করতে হবে মুদির দোকানে। নাপিতের দোকানে।'

'চায়ের স্টল?'

'না, চায়ের স্টল না। বাড়ির আশপাশের চায়ের স্টলে শুধু ব্যাচেলাররা চা খায়। যার ঘর-সংসার আছে সে বাড়ির পাশে চায়ের দোকানে চা খাবে না। সে বউকে বা মেয়েকে চা বানিয়ে দিতে বলবে।'

'ঐ লোকের বউ বা মেয়ে আছে কি-না তা তো জানি না।'

'তাহলে একটা সমস্যা হয়ে গেল। যাই হোক অসুবিধা হবে না। বিটের পোস্টম্যানকে ধরতে হবে। এদের স্মৃতিশক্তি ভাল হয়। নাম বলা মাত্র চিনে ফেলতে পারে।'

'পোস্টম্যানের কথা আমার একবারও মনে হয়নি।'

'রেশনের দোকান উঠে গেছে। রেশন শপ থাকলে সমস্যা হত না। ভাল ভাল জিনিসই দেশ থেকে উঠে যাচ্ছে।'

ব্যাঙাচির খাওয়া শেষ হয়েছে। সে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে চা দিতে বলল। তার পেটে নিশ্চয়ই এখনো ক্ষিধে আছে। তবে প্রবল ক্ষিধের সমস্যা মিটেছে তা বোঝা যায়।

'হেভী খেয়েছি দোস্ত। তোর কাছে অনৃঋণ হয়ে গেল। যাই হোক ঋণ শোধ করব, চিন্তা করিস না। বিষয়টা নিয়ে সিরিয়াস চিন্তা করছি। অতীশ দীপংকর রোডের পোস্টম্যান হল আমাদের সার্কেলের কেন্দ্রবিন্দু। তারপর ধীরে ধীরে সার্কেলটা বড় করব। পাঁচ বছর আগে হলে লন্ড্রী থেকে চট করে বের করে ফেলা যেত। এখন আর যাবে না। ঢাকা শহরে লন্ড্রী নেই। লোকজন এখন আর ধোপাখানায় কাপড় ধোয় না।'

'এটা তো লক্ষ্য করিনি।'

'তোর লক্ষ্য না করলেও হবে। আমি করছি। ব্যাটাকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব এখন আমার। তোর অনৃঋণ শোধ দিতে হবে। চল উঠি, একশানে নেমে পড়ি।'

'যে খাওয়া খেয়েছিস হাঁটতে পারবি তো?'

ব্যাঙাচি করুণ গলায় বলল, হাঁটতে পারব না দোস্ত। রিকশা নিতে হবে। এখন হাঁটলে আবার ক্ষিধে পেয়ে যাবে। অনেক কষ্টে ক্ষিধেটা চাপা দিয়েছি।

রেস্টুরেন্টে বাকি খাওয়া যায়—বাকিতে রিকশা পাওয়া কষ্টকর ব্যাপার। সম্ভব না বলেই আমার ধারণা। লিফট পাওয়া গেলে হত। বিদেশে এই সব ক্ষেত্রে বুড়ো আঙ্গুল তুলে লোকজন দাঁড়িয়ে থাকে। কারোর দয়া হলে তুলে নেয়। বাংলাদেশে লিফট প্রথা চালু হয়নি। কার দায় পড়েছে নিজের কেনা গাড়িতে অন্যকে চড়ানো।

অবশ্যি এ জাতীয় পরিস্থিতিতে গাড়িওয়ালা মানুষের কাছ থেকে মাঝে মধ্যে আমি উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পেয়েছি। শুধু উৎসাহব্যঞ্জক বললে ভুল হবে, খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। একবার উত্তরার কাছে এক পান-সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। রাত একটার মত বাজে। পান-সিগারেটের একটা দোকান খোলা। সেও বন্ধের উপক্রম করছে। হেঁটে হেঁটে ঢাকায় ফিরতে ইচ্ছা করছে না। একটা মিলিটারী জীপ এসে থামল। জীপের ড্রাইভার নেমে এল সিগারেট কিনতে। ড্রাইভারের পাশে বিষণ্ণমুখে যে অফিসারটি বসে আছেন মনে হয় তাঁর জন্যেই সিগারেট কেনা হচ্ছে। অফিসার কোন স্তরের বুঝতে পারছি না। এত বিষণ্ণ কেন তাও বুঝতে পারছি না। যুদ্ধটুদ্ধ হচ্ছে না বলেই মনে হয় বিষণ্ণ। যুদ্ধ নেই কাজেই কাজও নেই। আমি এগিয়ে গেলাম। তিনি মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। আমি বললাম, স্যার আপনার গাড়ির পেছনটা তো ফাঁকা। আপনি কি একজনকে পেছনে বসিয়ে ঢাকা নিয়ে যাবেন? তার খুব উপকার হয়।

অফিসার কিছু বললেন না। একবার আমাকে দেখেই মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। ইতিমধ্যে ড্রাইভার সিগারেট নিয়ে ফিরেছে। তিনি সিগারেট নিয়ে প্যাকেট খুলে

সিগারেট বের করতে শুরু করেছেন। ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দিতে যাচ্ছে। তিনি ড্রাইভারকে নিচু গলায় কি যেন বললেন—ড্রাইভার অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে নেমে এল। জীপের পেছনটা আমাকে খুলে দিল।

আমি উঠে বসলাম। গাড়ি চলতে শুরু করল। সেই অফিসার আমাকে অবাক করে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি সিগারেট খেলে ধোঁয়াতে আপনার কি অসুবিধা হবে?'

আমি বললাম, 'অসুবিধা হবে না, স্যার। বরং সুবিধা হবে। অনেকক্ষণ সিগারেট খাচ্ছি না। আপনার সেকেন্ড হ্যান্ড ধোঁয়া পাব।'

'তিনি তাঁর প্যাকেট বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, নিন, সিগারেট নিন।'

আমি সিগারেট নিলাম। তিনি জীপের ড্যাসবোর্ডে কি একটা টিপলেন, ওমনি ক্যাসেটে রবীন্দ্র সংগীত শুরু হয়ে গেল—

"বধু কোন আলো লাগল চোখে"

মিলিটারী জীপ হুঁস-হাস করে অনেক সময়ই আমার পাশ দিয়ে বের হয়ে গেছে। সেখান থেকে কখনো রবীন্দ্র সংগীত ভেসে আসতে শুনিনি। আমার ধারণা মিলিটারী জীপে ক্যাসেট বাজানোর যন্ত্রই থাকে না। আর থাকলেও ট্রাম্পেট জাতীয় বাজনা বাজবে। রবীন্দ্রনাথ না।

আমি বললাম, স্যার, আমাকে ক্যান্টনমেন্টের কাছাকাছি যে কোন জায়গায় নামিয়ে দিলেই হবে।

বিষণ্ণ চেহারার ভদ্রলোক তার জবাব দিলেন না। মনে হচ্ছে তিনি আপনমনে গান শুনছেন। মিলিটারীর গান শোনাও অদ্ভুত। মাথা দুলানো না। পা দুলানো না। এটেনশন ভঙ্গিতে গান শোনা।

ক্যান্টনমেন্টের কাছাকাছি তিনি আমাকে নামিয়ে দিলেন না। গাড়ি প্রথমেই চলে গেল ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে। স্যালুটের পর স্যালুট পড়তে লাগল। ভদ্রলোক যে বিরাট বড় দরের কেউ এখন বুঝলাম।

তিনি জীপ থেকে নামলেন। ড্রাইভারকে বললেন, উনাকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছে দাও।

আমি বললাম, 'স্যার, কোন দরকার নেই। আমার হেঁটে অভ্যাস আছে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'অনেক রাত হয়েছে। আপনাকে বাসায় পৌঁছে দেবে, কোন সমস্যা নেই। নিন আরেকটা সিগারেট নিন। ওয়ান ফর দ্য রোড। আচ্ছা, রেখে দিন। প্যাকেটটা রেখে দিন। আমি সিগারেট ছেড়ে দেবার চেষ্টা করছি। আজ লোভে পড়ে কিনে ফেলেছি।'

ড্রাইভার অবশ্যি আমাকে আমার মেস পর্যন্ত নিয়ে গেল না। ক্যান্টনমেন্ট থেকে গাড়ি বের করে সামান্য এগিয়ে কঠিন ব্রেক করে গাড়ি থামাল। তার চেয়ে কঠিন গলায় বলল, 'নামেন।'

আমি বিনীত ভঙ্গিতে ড্রাইভারকে বললাম, 'ভাই সাহেব আপনার না আমাকে বাড়ি পর্যন্ত দিয়ে যাবার কথা?'

'নামতে বলছি, নামেন।'

আমি হুড়মুড় করে নেমে পড়লাম। মিলিটারী মানুষ রেগে গিয়ে চড়-থাপ্পর মেরে বসতে পারে। কি দরকার।

কাজেই আমাদের দেশের গাড়িওয়ালারা পথচারীদের প্রতি একেবারেই যে দয়া দেখান না, তা না। মাঝে মধ্যে দেখান। সেই মাঝে মধ্যেটা আজও হতে পারে। মিষ্টি কথায় চিড়া ভেজে না বলে গাড়িওয়ালাদের মন ভিজবে না কেন। গাড়িওয়ালাদের মন এমনিতেই খানিকটা ভেজা অবস্থায় থাকে।

আমি ব্যাঙাচিকে নিয়ে গাড়ির সন্ধানে বের হলাম। আমাদের টার্গেট ঝকঝকে নতুন গাড়ি। দামী গাড়ি। পাজেরো টাইপ। চড়বই যখন দামী গাড়িতেই চড়ি।

যেসব গাড়ি পছন্দ হচ্ছে তার কোনটাই দাঁড়াচ্ছে না— হোস করে চলে যাচ্ছে। গাড়িগুলি থামানোর একমাত্র উপায় হচ্ছে, রাস্তার ঠিক মাঝখানে কাকতাড়ুয়ার মত দু'হাত মেলে দাঁড়ানো। আমি আর ব্যাঙাচি দু'জন হাত ধরাধরি করে রাস্তা আটকালে গাড়ি থামতে বাধ্য। প্রথমে একটা থামবে তার পেছনে আরেকটা। দেখতে দেখতে সিরিয়াস যানজট লেগে যাবে। গাড়িতে গাড়িতে গিট্টু। কেউ বুঝতে পারবে না যানজট কেন হচ্ছে। এক সময় গুজব ছড়িয়ে পড়বে— যানজট হচ্ছে কারণ সামনে মিছিল বের হয়েছে, গাড়ি ভাঙ্গাভাঙ্গি হচ্ছে। বিশ্বাসযোগ্য গুজব বলেই সবাই সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করে ফেলবে। পেছনের গাড়িগুলি তখন চেষ্টা করবে উল্টো দিকে ঘুরাতে। এই চেষ্টার ফলে এমন যানজট হবে যে সারাদিনের জন্যে নিশ্চিন্ত। রাজনৈতিক নেতারা খবর পাবেন যে মিছিল বের হয়েছে, গাড়ি ভাংচুর হচ্ছে। তাঁরা ভাববেন যেহেতু তাঁরা মিছিল করেননি—কাজেই বিপক্ষ দল মিছিল বের করেছে। তাঁরা আন্দোলনে পিছিয়ে পড়েছেন। কি সর্বনাশ! তাঁরা তড়িঘড়ি করে জঙ্গি মিছিল বের করবেন। এবং তখন সত্যি সত্যি শুরু হবে গাড়ি ভাঙ্গাভাঙ্গি।

পুলিশের টিয়ার গ্যাস নিয়ে ছোটাছুটি। টিয়ার গ্যাসের সেল মারবে কি, মারবে না বুঝতে পারছে না। সরকারী দলের মিছিলে টিয়ার গ্যাসের শেল মারতে খবর আছে। এই হাঙ্গামার মধ্যে কেউ না কেউ মারা যাবে। নাম পরিচয়হীন সেই

লাশ নিয়ে পড়ে যাবে কাড়াকড়ি। একদল বলবে এই লাশ বিএনপি কর্মীর, আরেক দল বলবে আওয়ামী লীগের। অথচ কেউ জানে না মৃত মানুষের কোন দল থাকে না।

আমি ব্যাঙাচিকে আমার সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়া করাতে রাজি করতে পারলাম না। সে চোখ কপালে তুলে বলল, 'দোস্ত তুই কি পাগল হয়ে গেলি নাকি? গাড়ি আমাকে চাপা দিয়ে চলে যাবে। তুই শেষ মুহূর্তে লাফ দিয়ে পার পাবি। আমি তো লাফও দিতে পারি না। নাম ব্যাঙাচি হলে কি হবে লাফাতে তো পারি না। আমি বরং রাস্তার পাশে দাঁড়াই।'

ব্যাঙাচি চিন্তিত মুখে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। আমি দু'হাত মেলে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়ালাম। দেখতে দেখতে ফল পেলাম। প্রায় নতুন একটা পাজেরো জীপ (আমার খুব পছন্দের গাড়ি) আমার সামনে এসে দাঁড়াল। ড্রাইভারের পাশের সীট থেকে এক সানগ্লাস পরা লোক মাথা বের করে বলল, কি ব্যাপার?

ভদ্রলোককে খুব চেনা চেনা লাগছে। কোথায় দেখেছি বুঝতে পারছি না। সানগ্লাস খুললে হয়ত চিনতে পারব।

'আপনি কি চাচ্ছেন?'

'স্যার, আমরা দুই বন্ধু আপনার কাছে লিফট চাচ্ছি। আমাদের অতীশ দীপংকর রোডে নামিয়ে দিন।'

'লিফটের জন্যে হাত উঁচিয়ে গাড়ি থামালেন?'

'জ্বি।'

'আসুন, উঠে আসুন। আপনার বন্ধুকেও ডাকুন।'

ব্যাঙাচি গাড়িতে উঠতে উঠতে ফিস্‌ফিস্ করে আমাকে বলল, 'দোস্ত, তোর প্রতিভা দেখে আমি মুগ্ধ। তুই তো মানব না, মহামানব। গাড়িতে লোকজন না থাকলে আমি তোর পায়ের ধুলা নিতাম।'

গাড়ি অতীশ দীপংকর রোডের দিকে গেল না। রমনা থানার সামনে থামল। চশমা পরা ভদ্রলোক বললেন, 'আপনারা নামুন। আমি আপনাদের পুলিশের কাছে হ্যান্ডওভার করব।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কেন?'

'আমাকে চিনতে পারছেন না?'

'চেনাচেনা লাগছে। আপনি কি বিখ্যাত কেউ?'

'আমি বিখ্যাত কেউ না। আগে একদিন আপনি আমাকে উল্টাপাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন। আমি গাড়ির কাচ তুলে দিলাম—আপনি বাইরে থেকে ভেংচি কাটছিলেন। নানান অঙ্গভঙ্গি করছিলেন। এখন চিনতে পেরেছেন?'

'জ্বি। এখন চিনতে পারছি। চোখে সানগ্লাস থাকায় চিনতে অসুবিধা হচ্ছিল।'

'আজ আবার গাড়ি আটকেছেন। ইউ আর এ পাবলিক ন্যুইসেন্স। পুলিশের উচিত আপনাদের সম্পর্কে খোঁজখবর করা।'

ব্যাঙাচি শুকনো গলায় বলল, 'স্যার আপনি কিছু মনে করবেন না। আমরা হেঁটে হেঁটে অতীশ দীপংকর রোডে চলে যাব। হাঁটাটা স্বাস্থ্যের জন্যেও ভাল। আপনি চলে যান, আপনাকে শুধু শুধু দেরি করিয়ে দিলাম। আমরা দুই বন্ধুই আন্তরিক দুঃখিত। আওয়ার এপলজি।'

এপলজিতে কাজ হল না। রমনা থানার সেকেন্ড অফিসার বিরসমুখে আমাদের হাজতে ঢুকিয়ে দিলেন। এছাড়া তার উপায়ও ছিল না। যে ভদ্রলোক আমাদের নিয়ে এসেছেন তিনি এক প্রতিমন্ত্রীর শালা। মন্ত্রীর শালাদের ক্ষমতা মন্ত্রীদের চেয়ে অনেক বেশি থাকে। মন্ত্রী তাঁর পাজেরো গাড়ি নিয়ে যত ঘুরেন—তার শালা তার চেয়ে বেশি ঘুরেন। এটাই নিয়ম।

ব্যাঙাচি পুরোপুরি হকচকিয়ে গেছে। তার করুণ মুখ দেখে মায়া লাগছে। কেঁদেটেদে ফেলবে কিনা বুঝতে পারছি না। সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না। সম্ভবত এটাই তার প্রথম হাজত বাস।

ব্যাঙাচি হতভম্ব গলায় বলল, 'দোস্ত, সর্বনাশ হয়ে গেলো তো।'

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, 'সর্বনাশের কি আছে?'

'তোর ভাবী যখন শুনবে আমি হাজতে তখন অবস্থাটা কি হবে বুঝতে পারছিস না?'

'ভাবী খুশিও হতে পারে। হাজতে থাকা মানে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ। ভাবীর তো খুশি হবারই কথা।'

'হাজতে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ মানে? এরা খেতে দেয় না?'

'পার হেড এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা বাজেট। এই টাকায় কি খাবি? এর আগে একবার হাজতে আমি সারাদিনে একটা কলা খেয়েছিলাম। অবশ্যি বেশ বড় সাইজ কলা।'

'তুই কি এর আগেও হাজতে ছিলি নাকি?'

'থাকি মাঝে মধ্যে।'

'কি সর্বনাশ বলিস কি? তোর সঙ্গে মেশা, তো ঠিক হয়নি।'

'এবার ছাড়া পাবার পর আর মিশিস না।'

'ছাড়া পাব কিভাবে?'

'আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে পুলিশের বড় কর্তা, কিংবা মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী কেউ আছে?'

'না।'

'মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর শালাদের কারোর সঙ্গে মহব্বত আছে?'

'তোর ভাবীর থাকতে পারে। আমার নেই।'

'শেখ হাসিনা, কিংবা বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে পরিচিত কেউ কি আছে যে তোকে চেনে।'

'আমার জানা মতে নেই। তবে তোর ভাবীর থাকতে পারে। ওর কানেকশন ভাল।'

'তাহলে টেলিফোন করে ভাবীকে বল। ভাবী একটা-কিছু ব্যবস্থা করবে।'

'সর্বনাশ তোর ভাবীকে জানানোই যাবে না। আমি হাজতে আছি শুনলে কারবালা হয়ে যাবে।পুলিশ শুনেছি ঘুষ খায়। এরা খাবে না?'

প্রতিমন্ত্রীর শালা এসে আমাদের দিয়ে গেছে তো—পুলিশ এখন আর ঘুষ খাবে না। তবে আমাদের নিজ থেকেই উচিত পান খাওয়ার জন্যে তাদের কিছু দেয়া। মারের হাত থেকে বাঁচার জন্যেই দিতে হবে।

ব্যাঙাচি আঁৎকে উঠে বলল, 'মারবে নাকি?'

'মারবে তো বটেই। কথা বের করার জন্যে মারবে। ইন্টারোগেশনের টাইমে হেভি ধোলাই দিতে পারে। তোর সঙ্গে কথা বলছে, কথা বলছে—স্বাভাবিক ভাবেই বলছে, আচমকা গদাম করে তলপেটে এক ঘুষি।'

'বলিস কি? ইন্টারোগেশন কখন হবে?'

'ওসি সাহেবের সময় হলেই হবে। যত দেরিতে উনার সময় হয় ততই ভাল। এত দুঃচিন্তা করে লাভ নেই। ঘুমিয়ে থাক।'

'হিমু!'

'বল।'

'দোস্ত, তুই কিছু মনে করিস না। তোকে একটা সত্যি কথা বলি। তোর সঙ্গে মেশা আমার ঠিক হয়নি। বিরাট ভুল হয়েছে। গ্রেট মিসটেক। তোকে ভাল মানুষের মত দেখালেও তুই আসলে ডেঞ্জারাস।'

'আর মিশিস না।'

'মিশিস না বললেই তো হবে না। তুই আমার বাল্যবন্ধু।'

'বিপদের সময় বাল্য-বন্ধু, বৃদ্ধ-বন্ধু কোন ব্যাপার না।'

'এটাও ঠিক বলেছিস। দোস্ত, এখানে বাথরুমের কি ব্যবস্থা? আমার টেনশানে বাথরুম পেয়ে গেছে।'

'ছোট বাথরুম হলে এক কোণায় বসে পড়। হাজতের সেলে ছোট বাথরুম করা যায়। কেউ কিছু বলে না। বড়টা হলে সমস্যা আছে।'

'কি সমস্যা?'

'সেন্ট্রিকে ডাকতে হবে। তার যদি দয়া হয় বাথরুমে নিয়ে যাবে।'

'দয়া না হলে?'

'দয়া না হলে দয়া তৈরি করার সিস্টেম আছে। টাকা দিলেই দয়া তৈরি হয়।'

'আমাদের সঙ্গে তো টাকা নেই।'

'তোর কি বড়টা পেয়েছে?'

হুঁ। সকালবেলা বাউলস ক্লিয়ার হয়েছে— এখন এই টেনশানটায় সিস্টেমে গন্ডগোল— আগামীকাল সকালে যেটা হবার কথা সেটা এখন হতে চাচ্ছে। দোস্ত কি করব?'

'দেখি, সেন্ট্রিকে ডাকি।'

'যদি রাজি না হয়? দোস্ত আমার পানির পিপাসাও পেয়েছে। এখানে পানি খাবার সিস্টেম কি?'

'বাথরুমে যখন নিয়ে যাবে ঐ সময় পানি খেয়ে নিবি। উটের মত বেশি করে খাবি। যাতে জমা করে রাখতে পারিস। আবার পানি খাবার সুযোগ কখন হবে কে জানে।'

ব্যাঙাচি করুণ চোখে তাকিয়ে আছে। তার কপাল ঘামছে। ঠোঁট শুকিয়ে গেছে। বিড়বিড় করে কি যেন বলছে। মনে হয় কোন দোয়া-টোয়া পড়ছে। নিয়ামুল কোরানে কোন বিপদে কোন দোয়া পড়তে হয় তার বিবরণ আছে। ঝড়ের সময়ে দোয়া, আগুন লাগলে দোয়া, দামী জিনিস হারিয়ে গেলে খুঁজে পাবার দোয়া... পুলিশের হাতে পরলে কোন দোয়া পড়তে হবে সেটা নেই। থাকলে জনগণের উপকার হত।

ওসি সাহেব প্রথমে আমাকে ডাকলেন। তাও ঠিক সন্ধ্যার আগে আগে। ভদ্রলোক গম্ভীর প্রকৃতির। চেহারার মধ্যেই একটা ঘুষ খাই, ঘুষ খাই ভাব। মাঝে মাঝে জিব বের করে ঠোঁট চাটেন। চাটা দেখে মনে হয় ঠোঁটে অদৃশ্য চিনি মাখানো। জিব দিয়ে সেই চিনি চেটে নিয়ে মজা করে খাচ্ছেন।

'আপনার নাম?'

'স্যার, আমার ভাল নাম হিমালয়। ডাক নাম হিমু।'

'হাজতে এই প্রথম এসেছেন, না এর আগেও এসেছেন?'

'এর আগেও বেশ কয়েকবার এসেছি।'

'তাহলে তো আপনি আত্মীয়ের মধ্যেই পড়েন। কখনো কনভিকশান হয়েছে?'

'জ্বি না। হাজত থেকেই ছাড়া পেয়ে গেছি।'

'এইবার পাবেন না। এইবার জেলখানার ল্যাপসি খাওয়াবার ব্যবস্থা করে দেব।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'মনে হচ্ছে আমার কথা শুনে মজা পাচ্ছেন। মজার ইংরেজী জানেন?'

'জানি স্যার —ফান।'

'এইবার আপনার ফানের ব্যবস্থা করে দেব। গাড়ি ভাঙ্গতে খুব মজা লাগে?'

'স্যার, আপনার সামান্য ভুল হয়েছে। আমি গাড়ি ভাঙ্গিনি। অতি ভদ্রভাষায় লিফট চেয়েছিলাম। উনি লিফট দেয়ার নাম করে থানায় নিয়ে এসেছেন।'

'তাই নাকি?'

'জ্বি স্যার, এটাই ঘটনা। বাংলাদেশ পেনাল কোডে — কথা দিয়ে কথা না রাখার কি কোন শাস্তি আছে? যদি থাকে তাহলে তাঁর শাস্তি পাওয়া উচিত।'

'আপনি কি নিজেকে অতিরিক্ত চালাক ভাবেন?'

'জ্বি না, ভাবি না। তবে স্যার, সত্যি কথা বলতে কি — আমি যেমন নিজেকে চালাক ভাবি না — অন্যকেও ভাবি না।'

'আপনি কার গাড়ি ভেঙ্গেছেন সেটা জানেন?'

'স্যার, আমি কারোর গাড়ি ভাঙ্গিনি। তবে যিনি গাড়ি ভাঙ্গার কথা বলছেন তিনি ক্ষমতাবান মানুষ মন্ত্রীর শ্যালক। এই তথ্য জানি।'

'তিনি এফ আই আর করে গেছেন— আপনি এবং আপনার বন্ধু মিলে তাঁর গাড়ি ভেঙ্গেছেন। এবং আগে একদিন তাঁকে ভয় দেখিয়েছেন। থান ইট দিয়ে তার মাথা ভেঙ্গে দিতে চেয়েছিলেন।'

'থান ইট দিয়ে মাথা ভেঙ্গে দেবার কথাটা সত্যি না হলেও ভয় দেখাবার ব্যাপারটা সত্যি।'

'ভয় কিভাবে দেখিয়েছেন?'

'ভেঙচি কেটেছি। বাচ্চারা কাউকে ভেঙচি দিলে ভয় লাগে না। কিন্তু বড় কোন মানুষ ভেঙচি কাটলে বুকে ধাক্কার মত লাগে। কিভাবে ভেঙচি কেটেছিলাম সেটা কি স্যার ডেমনসট্রেট করে দেখাব?'

'অবশ্যই দেখাবেন। আপনার মত ফাজিলদের কি চিকিৎসা আমরা করি সেটা আগে একটু ডেমনসট্রেট করে দেখাই। প্রথমে আমাদের ডেমনসট্রেশন, তারপর আপনারটা।'

'আপনাদের কর্মকাণ্ড শুরু হবার আগে আমি কি একটা কথা বলতে পারি?'

'পারেন।'

'আপনার বোধহয় মনে আছে যে, আপনাকে আমি শুরুতেই বলেছি, আমি এর আগে বেশ কয়েকবার হাজতে এসেছি। প্রতিবারই ছাড়া পেয়েছি। কোন কনভিকশন হয়নি। তা থেকে কি প্রমাণিত হয় না যে, আমিও ক্ষমতাবান একজন মানুষ। মন্ত্রীর শালার চেয়েও আমার ক্ষমতা বেশি। কাজেই আপনি যা করবেন ভেবেচিন্তে করবেন। ইংরেজী ঐ বাক্যটা আশা করি আপনি জানেন —

Look before you leap.

ঝাঁপ দেবার আগে ভাল করে দেখ। একবার ঝাঁপ দিয়ে ফেললে কিন্তু সমস্যা।

ওসি সাহেব জিভ চাটা বন্ধ করেছেন। সরু চোখে তাকাচ্ছেন। ভেতরে একটু যে থমকে গেছেন তা বোঝা যাচ্ছে। কাজেই এই সুযোগটা নিতে হবে। ওসি সাহেবকে ভড়কে দিতে পারলে কিল-থাপ্পড় থেকে আপাতত রক্ষা পাওয়া যাবে।

'আপনি বলতে যাচ্ছেন যে আপনি একজন বিগ শট?'

'জ্বি না, আমি অত্যন্ত ক্ষুদ্র প্রাণী — ভেরী স্মল শট। জীবাণু টাইপ। আমার পাজেরো গাড়ি নেই, মন্ত্রী দুলাভাই নেই— এবং পায়ে জুতা পর্যন্ত নেই। যদি কিছু মনে না করেন— কবীরের একটা দোঁহা আপনাকে শুনাতে পারি?'

'কারে কি শুনাতে চাচ্ছেন?'

'কবীরের দোঁহা — কবীর বলছেন,

হরি নে আপনা আপ ছিপায়।
হরি নে নফীজ কর দিখরায়া—

'এর মানে কি?'

'এর মানে হচ্ছে, ঈশ্বর আপনাকে আপনি লুকিয়ে রাখেন আবার কি অদ্ভুত সুন্দর করেই না নিজেকে প্রকাশিত করেন।'

'আপনি কি বলতে চাচ্ছেন কিছুই বুঝতে পারছি না। এই যে লাইন দু'টা বললেন— এর মানে কি?'

'মানে তো আপনাকে বললাম।'

'ব্যাখ্যা করেন।'

'ব্যাখ্যা করতে সময় লাগবে।'

'কত সময় লাগবে?'

'দুই তিন দিন সময় লাগবে। এক কাজ করুন, আমাকে দুই তিন দিন হাজতে রেখে দিন। আমি লাইন দু'টার ব্যাখ্যা করব। তবে একটা শর্ত আছে।'

'কি শর্ত?'

'আমার বন্ধুকে ছেড়ে দিতে হবে।'

'ও আচ্ছা।'

'ও আচ্ছা বলার দরকার নেই। মন্ত্রীর শালাবাবুর কাছে অপরাধ যা করেছি আমি করেছি। আমার বন্ধু করেনি। ওকে ছেড়ে দিন— আপনার লাভ হবে।'

'কি লাভ হবে?'

'সেটা যথাসময়ে দেখবেন। লাভ-লোকশান প্রসঙ্গেও কবীরের একটা দোঁহা আছে বলব?'

'দোঁহা ফোহা বাদ দিন। ঝেড়ে কাশুন। আপনি কে ঠিক করে বলুন? আপনার ব্যাক গ্রাউন্ড কি? আপনি করেন কি?'

'আমি স্যার কিছুই করি না। হলুদ পাঞ্জাবী পরে পথে পথে হাঁটি।'

'আপনার চলে কি ভাবে?'

'এত বড় একটা শহরে একজন মানুষের বেঁচে থাকা কোন কঠিন ব্যাপার না।'

'পথে পথে ঘুরেন কেন?'

'আমার বাবার জন্যে পথে পথে ঘুরি। আমার বাবার মাথা ছিল খারাপ। বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারত না। তাঁর সমস্ত আচার-আচরণ ছিল স্বাভাবিক মানুষের মত। শুধু চিন্তা ভাবনা ছিল পাগলের মত।'

'কি রকম?'

'তাঁর ধারণা হল— যদি ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে পাঠিয়ে ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ার বানানো যায়, ডাক্তারী স্কুলে পাঠিয়ে বানানো যায় ডাক্তার, তাহলে মহাপুরুষ বানানোর স্কুলে পাঠিয়ে ছেলেকে কেন মহাপুরুষ বানানো যাবে না।'

'মহাপুরুষ বানানোর স্কুল আছে নাকি?'

'জ্বি না, বাবা একটা স্কুল দিয়েছিলেন। তিনিই ছিলেন স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল আর আমি তাঁর ছাত্র। প্রথম এবং শেষ ছাত্র।'

'স্কুলে কি শেখানো হত?'

'নির্দিষ্ট কোন সিলেবাস ছিল না। প্রিন্সিপ্যাল সাহেবের মাথায় যখন যা আসত তাই ছিল পাঠ্যক্রম। একটা উদাহরণ দেই। আমি অন্ধকারে ভয় পেতাম। সেই ভয় কাটানোর জন্যে তিনি একদিন একরাতে আমাকে বাথরুমে তালাবন্ধ করে রেখেছিলেন। আমার বয়স তখন সাত।'

'বলেন কি, এ তো পাগলের কান্ড।'

'আগেই তো বলেছি বাবা পাগল ছিলেন।'

'আপনার মা বাধা দেননি?'

'মা যাতে বাধা দিতে না পারেন সেই জন্যে মাকে মেরে ফেলেছিলেন। বাবার ধারণা মাতৃস্নেহ মহাপুরুষ হবার প্রক্রিয়ায় বড় বাধা। মহাপুরুষকে সব রকম বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হবে। স্নেহের বন্ধন, মায়ার বন্ধন, ভালবাসার বন্ধন।'

'আই সি। বাবার ট্রেনিং এর ফলে আপনি কি মহাপুরুষ হয়েছেন?'

'জ্বি না। মনে হয় পাশ করতে পারিনি। ফেল করেছি। তবে......'

'তবে আবার কি?'

'লোকজনদের খানিকটা বিভ্রান্ত করতে পারি। এটা মহাপুরুষদের একটা লক্ষণ। মহাপুরুষদের কর্মকান্ডে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়। সত্যি করে বলুন তো স্যার আপনি কি বিভ্রান্ত হননি?'

'আমি বিভ্রান্ত হয়েছি?'

'জ্বি হয়েছেন। আপনার মনে সন্দেহ ঢুকে গেছে। আপনি ভাবছেন – হলুদ পাঞ্জাবী পরা এই লোকটা মহাপুরুষ হলেও তো হতে পারে। আপনার মন দুর্বল বলেই সন্দেহটা প্রবল।'

'আমার মন দুর্বল?'

'জ্বি স্যার— ঘুষ যারা খায় তাদের মন দুর্বল থাকে।'

'আই সি।'

'আপনি কি স্যার দয়া করে আমার বন্ধুকে ছেড়ে দেবেন?'

ওসি সাহেব বেশ কিছুক্ষণ ঝিম ধরে রইলেন। এক সময় তাঁর ঝিম কাটল। তিনি মিনিট তিনেক পা নাচালেন। মানুষ সাধারণত একটা পা নাচায়— উনি দু'টা পা এক সঙ্গে নাচাচ্ছেন। দেখতে ভাল লাগছে। পা নাচানো থামল। ওসি সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে যান— আপনার বন্ধুকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি। আপনি কিন্তু আছেন।'

'অবশ্যই আছি। আপনাকে কবীরের দুই লাইনের ব্যাখ্যা না দিয়ে আমি যাব না।'

'চা খাবেন?'

'জ্বি চা খাব এবং একটা সিগারেট খাব। স্যার আরেকটা কথা, হাজতে ঢুকানোর পর কি একটা টেলিফোন করার সুযোগ পাওয়া যায় না। আত্মীয় - স্বজনকে জানানো যে, দয়া কর, দুশ্চিন্তা কর— আমি হাজতে আছি।'

'টেলিফোন করতে চান?'

'জ্বি চাই।'

'কাকে ফোন করবেন, প্রধানমন্ত্রীকে?'

'জ্বি না স্যার, আমি আপনাকে আগেই বলেছি যে আমি অত্যন্ত ক্ষুদ্র ব্যক্তি। জীবাণু টাইপ। জীবাণুর চেয়েও ছোট–ভাইরাস বলতে পারেন।'

'ভাইরাস মাঝে মাঝে ভয়ংকর হয়।'

'জ্বি স্যার, তা হয়।'

'নাম্বার বলুন আমি লাগিয়ে দিচ্ছি।'

'মন্ত্রী সাহেবের শালার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছি। উনার টেলিফোন নাম্বার তো আপনি রেখে দিয়েছেন। তাই না?'

'টেলিফোনে কি বলবেন?'

'সেটা এখনো ঠিক করিনি। বাংলাদেশ আইনে আমি হাজত থেকে একটা টেলিফোনের সুযোগ পাই। সেই সুযোগ ব্যবহার করতে চাচ্ছি।'

'আচ্ছা দেখি — উনি কথা বলতে চান কিনা কে জানে।'

ওসি সাহেব নিচু গলায় ভদ্রলোকের সঙ্গে আগে কিছুক্ষণ কথা বললেন। আমার সম্পর্কে কিছু বললেন বোধহয়। তারপর টেলিফোন আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। আমি আনন্দিত গলায় বললাম—'কেমন আছেন ভাই। আমি হিমু।

'কি চান আমার কাছে?'

'আমি আল্লাহ্‌র কাছেই কিছু চাই না, আর আপনার কাছে কি চাইব?'

'বড় বড় কথা শিখেছেন। মুখের চেয়ে জিহ্বা বড়। জিহ্বা এখন সাইজ মত কাটা পড়বে।'

'স্যার আপনার বুকের ব্যথাটার খবর কি শুরু হয়েছে?'

'তার মানে?'

'আমি একজন মহাপুরুষ টাইপ জিনিস। আপনি আমার নামে মিথ্যা ডাইরী করেছেন। তার শাস্তি হিসেবে আপনার বুকে ব্যথা শুরু হবার কথা। এখনো হচ্ছে না কেন বুঝতে পারছি না।'

'চড়িয়ে দাঁত ফেলে দেব হারামজাদা।'

'স্যার, ব্যথাটা খুব বেশি হলে দেরি না করে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে চলে যাবেন। এনজিষ্ট ট্যাবলেট আনিয়ে রাখুন। জিভের নিচে দিতে হবে।'

টেলিফোনের ওপাশে ভদ্রলোক রাগে থর থর করে কাঁপছেন। ভদ্রলোককে দেখা না গেলেও বোঝা যাচ্ছে। আমি তাঁর রাগ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে হাসিমুখে বললাম, 'আমার নামে মিথ্যা এফ আই আর করিয়েছেন— এটা ঠিক হয়নি। বুকের ব্যথা উঠামাত্র থানায় ওসি সাহেবকে সত্যি কথাটা জানাবেন। ব্যথা কমে

যাবে। আপনার দুলাভাই মিথ্যা বললে কোন সমস্যা না, তিনি মন্ত্রী মানুষ। মিথ্যা তিনি বলবেন না তো কে বলবে? তিনি সত্যি কথা বললেই সমস্যা।'

'সত্যি কথা বললে সমস্যা মানে?'

'মন্ত্রীরা মিথ্যা বলেন এটা ধরে নিয়েই আমরা চলি। এতে সিস্টেম অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কাজেই হঠাৎ একজন মন্ত্রী যদি সত্যি কথা বলা শুরু করেন তাহলে সমস্যা হবে না?'

'ফর ইওর ইনফরমেশন — আমার দুলাভাই কখনোই মিথ্যা বলেন না। এমপিরা ট্যাক্স ফ্রি গাড়ি পায় আপনি বোধহয় জানেন। সংসদে সব এমপিরা কোন বিষয়েই একমত হন না, শুধু ট্যাক্স ফ্রি গাড়ির বিষয় ছাড়া। সেখানে আমার দুলাভাই ট্যাক্স ফ্রি গাড়ি নেননি।'

'আমি যে গাড়িতে চড়তে চাইলাম সেটা তাহলে কার?'

'আমার।'

'স্যার আপনি কি করেন?'

'ব্যবসা।'

'গার্মেন্টস?'

'ঠিক ধরেছেন।'

'আপনাদের গার্মেন্টসে কি হলুদ পাঞ্জাবী হয়? আমাদের দু'টা হলুদ পাঞ্জাবী দিতে পারবেন? একটা আমার জন্যে, একটা ওসি সাহেবের জন্যে। আমার সাইজ চৌত্রিশ। ওসি সাহেবের ছয়ত্রিশ। এক্সট্রা লার্জ কিনলেই হবে।'

খট করে শব্দ হল। ভদ্রলোক টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। ওসি সাহেব চিন্তিত এবং বিরক্তমুখে বললেন, আপনি শুধু যে নিজে বিপদে পড়েছেন তা না। আপনি তো মনে হয় আমাকেও বিপদে ফেলেছেন। অনেক টাকা–পয়সা খরচ করে ঢাকায় পোস্টিং নিয়েছি— বিরাট ইনভেস্টমেন্ট। ইনভেস্টমেন্টের দশ ভাগের এক ভাগও এখনো তুলতে পারিনি। এর মধ্যে যদি বদলি করে দেয় তাহলে আম–ছালা সবই যাবে। শুধু পড়ে থাকবে আমের আঁটি। ভাল কথা, ভদ্রলোকের বুকে কি সত্যি ব্যথা উঠবে?

'জ্বি উঠবে। আমার আধ্যাত্মিক ক্ষমতার জন্যে না। এম্নিতেই উঠবে। মানসিক ভাবে দুর্বল তো তার জন্যে মনে একটা চাপ আছে। এ চাপ শরীরে চাপ ফেলবে। বুকে তীব্র ব্যথা হবে। এও হতে পারে— ব্যথা ট্যাথা কিছু হল না, কিন্তু মনে হবে ব্যথা হচ্ছে। স্যার, আমার বন্ধুকে ছাড়ার ব্যবস্থা করবেন না?'

'করছি। সিগারেট খাবেন?'

'জ্বি খাব'।

ব্যাঙাচি বিশ্বাসই করছে না যে তাকে ছেড়ে দিচ্ছে। সে একই সঙ্গে আনন্দিত এবং দুঃখিত। তাকে ছেড়ে দিচ্ছে এই আনন্দ তার রাখার জায়গা নেই। আবার আমাকে আটকে রেখেছে এই দুঃখেও সে আসলেই বিপর্যস্ত।

'দোস্ত তোকে রেখে চলে যেতে খুবই খারাপ লাগছে।'

'আমাকে তো রেখে যেতেই হবে। আমি দোষ করেছি গিল্টি পার্টি। তুই তো দোষ করিসনি।'

'তা ঠিক। তোর ভাবীর অনেক বড় বড় আত্মীয়-স্বজন আছে। তাদের ধরলেই তোর রিলিজের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু তোর ভাবীকে কিছুই বলা যাবে না। বুদ্ধিমতী মেয়ে তো, তোর কথা বললেই সে বলবে — তোমার বন্ধু হাজতে সেই খবর তোমাকে কে দিল? আমি তার জেরার মুখে পড়ে স্বীকার করে ফেলব যে আমিও হাজতে ছিলাম। দাবানল লেগে যাবে, বুঝলি।'

'বুঝতে পারছি।'

'শোন দোস্ত। তুই আশা ছাড়িস না, আমি ধর্মীয় লাইনে চেষ্টা করব। আমাদের বাড়ির পাশেই এক হাফেজ সাহেব আছেন। এক হাজার টাকায় কোরান খতম দেন। আর্জেন্ট ব্যবস্থাও আছে। খুব ইমার্জেন্সি হলে মাদ্রাসার তালেবুল এলেমদের নিয়ে চার ঘন্টায় খতম শেষ করে দোয়া করে দেন। দোস্ত তোর জন্যে এক্সট্রা ফি দিয়ে আর্জেন্ট দোয়া করাব। ইনশাল্লাহ্ আমি কথা দিলাম। আর আমি রোজ এসে তোর খোঁজখবর করব। টিফিন কেরিয়ারে করে খাওয়া নিয়ে আসব। প্রমিজ।'

'কিচ্ছু আনতে হবে না।'

'অবশ্যই আনতে হবে। তুই না খেয়ে থাকবি? দোস্ত মনে ভরসা রাখ— কাল সকালের মধ্যে খতম স্টার্ট হবে। ইনশাল্লাহ।'

আমাকে হাজতে থাকতে হল তিনদিন। ওসি সাহেবের সঙ্গে এই তিনদিন আমার কথা হল না। তিনি অসম্ভব ব্যস্ত। কোন একটা ঝামেলা হয়েছে — দিন রাত চব্বিশ ঘন্টাই তাকে ছোটাছুটি করতে হচ্ছে। এই তিনদিনে ব্যাঙাচির কোন খোঁজ নেই। তার টিফিন কেরিয়ার নিয়ে আসার কথা।

চতুর্থ দিন সকালে ওসি সাহেব আমাকে ছেড়ে দিয়ে ক্লান্তমুখে বললেন, যান, চলে যান।

'চলে যাব?'

'হ্যাঁ, চলে যাবেন। গত পরশুই আপনাকে ছেড়ে দেবার কথা। আমি অপারেশনে যাবার আগে সেকেণ্ড অফিসারকে বলে গিয়েছিলাম আপনাকে ছেড়ে দিতে। সে ভুলে গেছে। কিছু মনে করবেন না — দু' দিন এক্সট্রা হাজতবাস হল।'

'আপনাকে কবীরের দোঁহার ব্যাখ্যাটা তো বলা হল না।'

'ব্যাখ্যা বাদ দেন। আমার জান নিয়ে টানাটানি। খুব সমস্যায় আছি। এক কাপ চা খান— চা খেয়ে চলে যান। মনে কোন কষ্ট পুষে রাখবেন না। প্রতিমন্ত্রীর শালা টেলিফোন করে আমাকে বলেছেন যে, তিনি দুঃখিত — এই খবরটা যেন আপনাকে দেয়া হয়। আমি দিলাম। কাজেই আমার দায়িত্ব শেষ।'

'উনার কি ব্যথা উঠেছিল?'

'ব্যথার খবর জানি না। উঠেছে তো বটেই। হাসপাতাল থেকে টেলিফোন হয়েছে। গলা চিঁচিঁ করছে। আপনি ইন্টারেষ্টিং কারেক্টার।'

'থ্যাংক য়্যু।'

আমি ওসি সাহেবের সঙ্গে চা খেলাম। ওসি সাহেব দুঃখিত গলায় বললেন, মনটা খুবই খারাপ। মনে হয় আমাকে বদলি করে খাগড়াছড়ি-টরির দিকে পাঠাবে। শান্তি বাহিনীর ডলা খাব।

'শান্তি চুক্তি তো হয়ে গেছে, এখন আর কিসের ডলা?'

'এখনকার ডলা হবে আপোসের ডলা। শান্তি শান্তি ভাবে হাসতে হাসতে ডলা। যাই হোক, বাদ দেন। চায়ের সঙ্গে কিছু খাবেন?'

'একটা সিগারেট খাব।'

ওসি সাহেব সিগারেট দিলেন। লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাতে এসেছেন। বাতাসের জন্যে ধরাতে পারছেন না। বাতাসে লাইটারের আগুন নিভে যাচ্ছে। তিনি মহা বিরক্ত। আমি ওসি সাহেবকে বললাম, একটা মজার কথা কি জানেন ওসি সাহেব! ছোট্ট আগুনের শিখা বাতাসে নিভে যায়। কিন্তু বিশাল যে আগুন, যেমন মনে করুন দাবানল, বাতাস পেলে ফুলে-ফেঁপে উঠে।

ওসি সাহেব বললেন, এটাও কি কবীরের দোঁহা?

'জ্বি না, এটা হিমুর দোঁহা।'

'হিমুটা কে?'

'আমিই হিমু।'

'ও আচ্ছা, আপনি হিমু। একবার বলেছিলেন। ভুলে গিয়েছি। কিচ্ছু মনে থাকে না। এমন এক বিপদে আছি যা বলার না। কারো সঙ্গে পরামর্শও করতে পারছি না। এটা এমনই এক সেনসেটিভ ইস্যু যে পরামর্শও করা যাচ্ছে না। ইয়ে ভাল কথা, আপনি পরামর্শ কেমন দেন?'

'খুবই খারাপ পরামর্শ দেই। আমার পরামর্শ যে শুনবে তার অবস্থা কাহিল।'

'শুনি আপনার পরামর্শটা।'

'ঘটনা না শুনে পরামর্শ দেব কিভাবে।'

ওসি সাহেব গলা নামিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন, একটা রেপ হয়েছে। অল্প বয়েসী একটা মেয়েকে তার স্বামীর সামনে তিন মস্তান রেপ করেছে। মস্তান তিনটার আবার খুব ভাল পলিটিক্যালে কানেকশান আছে। মেয়ে এবং মেয়ের স্বামী এদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে।

'আপনাকে চাপ দেয়া হচ্ছে মামলা ভণ্ডুল করে দিতে?'

'এটা করলে তো ভালই ছিল। মামলা নষ্ট করা কোন ব্যাপারই না। আমাকে বলা হচ্ছে এই তিনজনের জায়গায় অন্য তিনজনের নাম ঢুকিয়ে দিতে। এটা কি করে সম্ভব বলেন?'

'সম্ভব না কেন? মেয়ে যে তিন নাম বলছে সেই তিন নাম না লিখে আপনি লিখবেন অন্য তিন নাম। ঐ তিনজনকে ধরে এনে রাম ছ্যাচা। ব্যাটা তোরা কেন রেপ করলি না? অন্যরা রেপ করে চলে গেল তোরা ছিলি কোথায়?'

'রসিকতা করছেন না? করেন, রসিকতা করেন। আমরা নষ্ট হয়ে গেছি। আমাদের নিয়ে তো রসিকতা করবেনই। যারা আমাদের নষ্ট করল তাদের নিয়ে রসিকতা করার সাহস আছে? নেতাদের হাত থেকে দেশটাকে বের করে এনে সাধারণ মানুষের হাতে দেন— তারপর ...

ওসি সাহেব চুপ করে গেলেন।

আমি বললাম, ওসি সাহেব একটা কাজ করলে কেমন হয়?

ওসি সাহেব ভুরু কুঁচকে বললেন, কি কাজ?

'আপনি সত্যি আসামীদের ধরে সেই ভাবেই কেইস সাজিয়ে দিন। নিরপরাধ তিনজনকে শাস্তি দেবেন সেটা কেমন কথা?'

ওসি সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, পাগলের মত কথা বলবেন না। দেশের পরিস্থিতি বিচার করে কথা বলবেন। হাই লেভেল থেকে যেটা চাওয়া হয় সেটাই করতে হবে।

'আপনি যখন সত্যি কাজটা করবেন তখন আপনি হাই লেভেলে চলে যাবেন। বাকি সবাই চলে যাবে লো লেভেলে।'

'আপনি বিদায় হোন। নিন, এ সিগারেটের প্যাকেটটা রেখে দিন। ঘুষের টাকায় কেনা। অসুবিধা নেই তো?'

'কোন অসুবিধা নেই।'

আমি থানা থেকে বের হলাম। ওসি সাহেবও আমার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে এলেন। তাকে খুব চিন্তিত লাগছে। তার চেহারা থেকে ঘুষ খাই, ঘুষ খাই ভাবটা চলে গেছে।



বন্ধ দরজায় হেলান দিয়ে তামান্নার জন্যে অপেক্ষা করতে পারি। সেটা ঠিক হবে কি? খাল কেটে হাঙ্গর নিয়ে আসা হবে না তো। ফ্ল্যাটবাড়িগুলিতে অবধারিতভাবে কিছু নিষ্কর্মা বডি বিল্ডার থাকে। তারা কারোর শালা, কারোর খালাতো ভাই। এদের প্রধান কাজ ফ্ল্যাটবাড়ির পবিত্রতা রক্ষা করা। কোন ছেলে কোন মেয়ের সঙ্গে ইটিস-পিটিস করছে কিনা তা লক্ষ্য রাখা, সন্দেহভাজন কেউ ঘুর ঘুর করছে কিনা তাও নজরে রাখা। বন্ধ দরজায় হেলান দিয়ে বসে থাকা অবশ্যই সন্দেহজনক কর্মকান্ডের ভেতর পড়ে। তামান্নার মা-বাবাই জানালা দিয়ে হাত ইশারা করে কাউকে ডাকিয়ে আনতে পারেন।

পানির তৃষ্ণা চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়ছে। কলিংবেল টিপে পানি খেতে চাইলে কেমন হয়? একবার পানি চাইলে দরজা খুলতেই হবে। তৃষ্ণার্তকে পানি দেবে না এমন বাঙালি মেয়ের এখনো জন্ম হয়নি। রোজহাশরের ময়দানে সূর্য চলে আসবে মাথার এক হাত উপরে। তৃষ্ণায় তখন বুকের ছাতি ফেটে যেতে চাইবে। তখন শুধুমাত্র তাদেরকেই পানি পান করানো হবে যারা তৃষ্ণার্তকে পানি পান করিয়েছে।

আমি কলিংবেলে হাত রাখলাম। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বডি বিল্ডার উপস্থিত হলেন। মনে হচ্ছে তাকে খবর দিয়ে আনানো হয়েছে। সম্ভবত তামান্নার মা পেছনের বারান্দা থেকে পাশের ফ্ল্যাটের মহিলার সঙ্গে কথা বলেছেন। কারণ বডি বিল্ডার শীতল গলায় বলল, ব্রাদার একটু নিচে আসেন। কুইক।

এইসব ক্ষেত্রে কোন রকম তর্কবিতর্কে যাওয়া ঠিক না। আমি হাসি মুখে বডি বিল্ডারের সঙ্গে নিচে নেমে এলাম। সেখানে আরো কয়েকজন অপেক্ষা করছে। অপেক্ষমান এক শুটকা যুবকই মনে হয় বডি বিল্ডারদের লীডার। সে জ্ঞানী টাইপ মুখ করে চেয়ারে বসে পা নাচাচ্ছে। মুখে সিগারেট। তবে সিগারেটে আগুন নেই। হাতে লাইটার আছে। সিগারেট এখনো ধরানো হয়নি। শুটকা তরুণ লাইটারটা এক হাত থেকে আরেক হাতে লোফালুফি করছে।

নিশ্চয়ই ভিসিআরে এমন কোন ছবি দেখেছে সেখানে নায়ক এইভাবে চেয়ারে বসে পা নাচায়, ঠোঁটে থাকে সিগারেট। সে হাতে লাইটার নিয়ে জগলিং করে। লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরানোর দৃশ্যটিও ইন্টারেস্টিং হবার কথা। আমি সেই দৃশ্য দেখার জন্যে আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি।

বডি বিল্ডার শুটকার দিকে তাকিয়ে বলল, মনা ভাই, ধইরা আনছি।

মনা ভাই পা নাচানো বন্ধ করে আমাকে দেখলেন। ইন্টারোগেশন পর্ব শুরু হল।

'কি নাম?'

'হিমু।'

'এখানে কার কাছে?'

'তামান্নার কাছে।'

'তামান্না কে হয়?'

'কিছু হয় না।'

'কিছু হয় না তাহলে এসেছেন কেন?'

'এখনো কিছু হয় না তবে ভবিষ্যতে হতে পারে।'

'তার মানে কি?'

'তামান্নার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা চলছে।'

মনা ভাই সঙ্গে সঙ্গে পা নাচানো বন্ধ করল। লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরাল। সে মনে হয় খানিকটা হকচকিয়ে গিয়েছে। হকচকিয়ে যাবার কারণে সিগারেট ধরানোর দৃশ্য তেমন জমল না।

'প্রেমের বিয়ে না এরেনজড ম্যারেজ?'

'এরেনজড ম্যারেজ। কথাবার্তা হচ্ছে।'

'কথাবার্তা কি পাকা হয়ে গেছে।'

'এখনো পাকেনি। বিয়ে পাকতে একটু সময় লাগে।'

'স্ট্রেইট কথা জিজ্ঞেস করছি, স্ট্রেইট জবাব দেবেন।'

'জ্বি আচ্ছা।'

মনা ভাই বডি বিল্ডারকে চোখের ইশারায় কাছে ডাকল। তাদের সঙ্গে কানে কানে কিছু কথা হল। বডি বিল্ডার অতি দ্রুত চলে গেল। সে ফিরে না আসা পর্যন্ত কর্মকান্ড স্থগিত। মনাভাই আবারো লাইটার নিয়ে লোফালুফি করছেন। আমি দেখছি ইতিমধ্যে আরো কিছু উৎসাহী দর্শক উপস্থিত হয়েছে। মজাদার কিছু দেখার আগ্রহে দর্শকরা চক চক করছে। এই ফ্লাটবাড়িতে মনা ভাই এর কারণে প্রায়ই মনে হয় মজাদার কিছু হয়।

বডি বিল্ডার ফেরত এল এবং আনন্দিত গলায় জানাল যে, তামান্নার মা হিমু নামে কাউকে চেনে না এবং তার মেয়ের কোন বিয়ের কথা হচ্ছে না।

মনা ভাই এর চোখ আনন্দে ঝলসে উঠল। সে মুখে সুরুয়া টানার মত শব্দ করল। বুঝতে পারছি আমার কাটা খাল দিয়ে হাঙ্গর ঢুকে পড়েছে। হাঙ্গরের হাত থেকে শুধুমাত্র তামান্নাই আমাকে বাঁচাতে পারে। আমি গলা খাঁকারি দিয়ে বললাম, মনা ভাই, আমার বিচার যা করার তামান্না এলে করবেন। আপাতত দড়ি দিয়ে আমাকে বেঁধে রাখুন। যাতে আমি পালিয়ে যেতে না পারি।

'দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখব।'

'জ্বি সেটাই ভাল হবে। শুধু একটা রিকোয়েষ্ট। কাউকে দিয়ে এক জগ ঠান্ডা পানি আনিয়ে দিন।'

মনা ভাই বলল, 'তুমি জামাই মানুষ পানি খাবে? তোমার জন্যে সরবতের ব্যবস্থা করি। ঠান্ডা সরবত।'

আমি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, 'জ্বি আচ্ছা।'

চারদিকে হাসাহাসি পড়ে গেল।

আমি ছাড়া পেলাম রাত এগারোটায়। তামান্না তার এক অসুস্থ বান্ধবীকে দেখতে গিয়ে ফিরতে দেরি করেছে। যে কারণে আমার রিলিজ অর্ডারেও দেরি হল। তামান্না আমাকে রিকশায় তুলে দিল এবং গম্ভীর ভঙ্গিতে বলল, 'আপনি দয়া করে আর কখনো এ বাড়িতে আসবেন না। আপনার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হচ্ছে এইসব ভুলে যান। আপনার সঙ্গে আমার কোন বিয়ের কথা হচ্ছে না।'

আমি বললাম, 'তামান্না, রিকশা ভাড়াটা দিয়ে দাও। আমার কাছে একটাও পয়সা নেই।'

তামান্না বলল, 'রিকশা ভাড়া দিয়ে দিচ্ছি। দয়া করে আমাকে তুমি করে ডাকবেন না।'

ঘরে ঢুকে চিঠি পেলাম। দু'টা চিঠি। ফাতেমা খালার ম্যানেজার লিখেছেন এবং ব্যাঙাচি লিখেছে। প্রথম পড়লাম ম্যানেজারের চিঠি।

> হিমু সাহেব,
>
> গত তিন দিনে আমি চারবার আপনার খোঁজ করেছি। আপনি কোথায় আছেন কেউ বলতে পারছে না। আপনাদের মেসের ম্যানেজার বলল, হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়া নাকি আপনার পুরানো রোগ। গত বছর একনাগাড়ে তিন মাস আপনার কোন খোঁজ ছিল না।

আমি খুবই চিন্তিত বোধ করছি। কারণ ম্যাডামের সিঙ্গাপুরে যাওয়া অত্যন্ত জরুরী। তিনি আপনার সঙ্গে কথা না বলে যেতে পারছেন না। সিঙ্গাপুর এয়ার লাইনসের টিকিট কাটা আছে, কিন্তু আপনার কারণে কনফার্ম করা যাচ্ছে না।

যাই হোক, এই চিঠি আপনার হাতে যেদিন আসবে দয়া করে সেদিনই ম্যাডামের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

বিনীত
রকিবুল ইসলাম।

ব্যাঙাচির চিঠিটার অর্ধেক বল পয়েন্টে লেখা। কয়েক লাইন বল পয়েন্টের কালি ফুরিয়ে যাওয়ায় বিনা কালিতে লেখা। তারপর লেখা পেনসিলে।

দোস্ত,

আমার উপর রাগ নিশ্চয়ই করেছিস। দোস্ত কি করব বল— থানায় যেতে সাহসে কুলায়নি। তবে তোর জন্যে কোরান মজিদ খতম দিয়েছি। জুমাবারে ইমাম সাহেবকে বলে স্পেশাল দোয়া করিয়ে দিয়েছি। তুই যে হাজতে আছিস সেই কথা বলিনি। শুধু বলেছি বিপদগ্রস্ত মমিন মুসলমান। হাজতে আছিস শুনলে মুছুল্লিদের কেউ কেউ অন্য কিছু ভেবে বসতে পারে। বিপদগ্রস্ত মমিন মুসলমানের জন্যে দোয়াতে কেউ আপত্তি করবে না।

যাই হোক, এখন আসল খবর হল তোর ইয়াকুব সাহেবের সন্ধান বের করেছি। তার পিতার নাম সুলেমান — তার ঠিকানা, (এইখানে কয়েক লাইন বিনা কালিতে লেখা)।

তোকে বাসা চিনিয়ে দেব। ভদ্রলোক মাই ডিয়ার টাইপের। অতিরিক্ত কথা বলেন। পেশায় জ্যোতিষী। মন্ত্রতন্ত্র জানেন। কবিরাজী চিকিৎসাও করেন। তিনি বলেছেন ইউনানী শাস্ত্রে মেদ-ভূড়ি কোন ব্যাপার না। তোর সাথে আলোচনা করে উনাকে দিয়ে চিকিৎসা করাব কিনা সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেব।

দোস্ত এখন বল তোর খোঁজখবর না নেয়ার জন্যে তুই রাগ করিস নাই। বাল্যবন্ধুর অপরাধ নিজ গুণে ক্ষমা করে দে।

ইতি তোর বাল্যবন্ধু
আরিফুল আলম জোয়ার্দার।

ফাতেমা খালার সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করলাম। ফাতেমা খালা বিস্মিত হয়ে বললেন, 'তুই কোত্থেকে? এতদিন ছিলি কোথায়?'

'এতদিন না খালা, মাত্র তিন দিন।'

'তোর জন্যে আমার সব আটকা পড়ে আছে। হোটেল রিজার্ভেশন করিয়ে ছিলাম লাস্ট মোমেন্টে তাও ক্যানসেল করালাম।'

'এখন আবার রিজার্ভেশন করাও।'

'ইয়াকুবের সন্ধান পাওয়া গেছে?'

'হ্যাঁ, পাওয়া গেছে।'

'আসল লোক তো? ফলস না?'

'না ফলস না।'

'তোর খালুকে চিনতে পারল?'

'এখনো তার সঙ্গে কথা হয়নি।'

'কথা না বলে ভাল করেছিস। আগবাড়িয়ে খবর্দার তুই কিছু জিজ্ঞেস করবি না। আগে ভাব দিবি। দরকার হলে রোজ যাবি। তাকে ইন কনফিডেন্সে নিয়ে নিবি। পারবি না?'

'পারব।'

'লোকটা দেখতে কেমন?'

'এখনো দেখিনি। শুধু সন্ধান বের করেছি।'

'আমি জানতাম তুই পারবি। গতকালই তামান্নাকে বলছিলাম যদি কেউ ইয়াকুবের খোঁজ-খবর করতে পারে হিমুই পারবে। ভাল কথা, লোকটা কি করে?'

'কবিরাজ।'

'কবিরাজ মানে কি?'

'অসুখ-বিসুখ হলে কবিরাজি মতে চিকিৎসা করে। তোমার গ্যাসের জন্যে এখন আর সিঙ্গাপুরে যেতে হবে না। তাকে বললেই বাসক পাতার রস, তুলসি পাতার রস, হিলিঞ্চা গাছের শিকড়-ফিকড় মিশিয়ে এমন জিনিস বানিয়ে দেবে যে এক ডোজ খেলেই গ্যাস হজম।'

'তুই বুঝতে পারছিস না হিমু। আমার অবস্থা ভয়াবহ। এমন গ্যাস হচ্ছে যে মাঝে মাঝে ভয় হয়, গ্যাস বেলুনের মত উপরে উঠে যাই কিনা। সিঙ্গাপুরে যে যাচ্ছি শখ করে তো যাচ্ছি না।'

'যাচ্ছ কবে?'

'যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় ততই ভাল। কাল তো পারব না, দেখি পরশু যেতে পারি কিনা। এর মধ্যে তুই বাসায় এসে বিশ হাজার টাকা নিয়ে যা। তোর কি ব্যাংকে একাউন্ট আছে?'

'না।'

'আমি ম্যানেজারকে বলে দেব—তোকে যেন ক্যাশ দেয়। ক্যাশ দেয়ার সিস্টেম অবশ্যি আমাদের নেই। আমাদের সব ট্রানজেকশান হয় চেকে। চেকে ট্রানজেকশনের বড় সুবিধা হল— একটা ডকুমেন্ট থাকে। যাই হোক, তোর জন্যে স্পেশাল ব্যবস্থা হবে। হিমু লোকটাকে তুই ডিটেকটিভের মত স্টাডি করবি। আচ্ছা লোকটা ম্যারিড নাকি?'

'খালা, আমি এখনো জানি না। আপনি সিঙ্গাপুর থেকে ঘুরে আসুন। ইতিমধ্যে আমি খোঁজখবর নিয়ে রাখব।'

ফাতেমা খালা আনন্দিত গলায় বললেন, 'তুই আমাকে খুশী করেছিস — দেখিস আমিও তোকে খুশী করিয়ে দেব।'

'তামান্নাকে ভজিয়ে ভাজিয়ে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবে?'

'দিতেও পারি।'

খালার গলার স্বরে রহস্যের ঝিলিক।



কুড়ি হাজার টাকা পাওয়া গেল।

একশ টাকার দু' টা বান্ডেল। সবই চকচকা নোট। নাকের কাছে ধরলে নেশার মত লাগে। সারাক্ষণ ধরে রাখতে ইচ্ছা করে।

ম্যানেজার সাহেব বললেন, টাকাটা গুনে নিন।

আমি সঙ্গে সঙ্গে গুনতে বসলাম। নতুন টাকা গুনতেও আনন্দ। কিছুক্ষণ গোনার পর হিসেবে গন্ডগোল হয়ে একান্ন না সাতান্ন সমস্যা দেখা দেয়। আবার নতুন করে গোনা। অসুবিধা কিছু নেই। আমার দৌড়ে গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে না। এসি ঘরের হিম হিম হাওয়ায় টাকা গোনা যেতে পারে।

ম্যানেজার সাহেব বিরক্ত মুখে আমার দিকে তাকাচ্ছেন। তাকে বিরক্ত করতেও ভাল লাগছে। মানুষকে বিরক্ত করা যত সহজ মনে হয় আসলে তত সহজ নয়। বরং বেশ কঠিন। নিউরোলজীর এক অধ্যাপক বলেছিলেন, মানুষের মস্তিষ্ক এমনভাবে তৈরি যে সে বিরক্ত হতে খুবই অপছন্দ করে। সে আনন্দিত হতে পছন্দ করে, রাগতে পছন্দ করে, কিন্তু বিরক্ত হতে পছন্দ করে না। কোন মস্তিষ্ককে ক্রমাগত বিরক্ত করতে থাকলে হয় সে বিরক্তিটাকে রাগে নিয়ে যাবে, কিংবা এমন কোন ব্যবস্থা করবে যাতে বিরক্তিকর ঘটনাটায় সে মজা পায়।

'হিমু সাহেব টাকা গোনা এখনো হল না।'

'জ্বি না। পঞ্চাশ ক্রশ করার পরই বেড়াছেঁড়া হয়ে যাচ্ছে।'

'আমার কাছে দিন গুনেদি। আপনি বরং চা খান।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে কি করবেন?'

'ভাবছি একটা পাথর কিনব।'

'ভাগ্য বদলানোর পাথর ব্লু স্যাফায়ার?'

'জ্বি না, সাধারণ পাথর। ভেঙ্গে রেল লাইনে দেয়, কিংবা বাড়ির ফাউন্ডেশনে ব্যবহার করে সেই পাথর।'

'পাথরটার দাম কুড়ি হাজার টাকা?'

'কততে বিক্রি করবে তা তো জানি না। কুড়ি হাজার হচ্ছে আমার লাস্ট অফার। দিলে দেবে, না দিলে নাই।'

ম্যানেজার সাহেব টাকা গোনা বন্ধ করে আমার দিকে তাকালেন। গম্ভীর গলায় বললেন, 'পাথরটার বিশেষত্ব কি?'

'বিশেষত্ব কিছুই নেই। পাথরের আবার বিশেষত্ব কি?

'তাহলে কুড়ি হাজার টাকায় কিনছেন কেন?'

'শখের জন্যে কিনছি। কিনতে পারব কিনা তাও জানি না। যার পাথর সেও শখ করে রাখছে।'

'পাথরের মালিক কে?'

'মালিকের নাম মেছকান্দর মিয়া। সে পেশায় একজন ভিক্ষুক।'

'আজই কিনবেন?'

'জ্বি।'

'যদি কিছু মনে না করেন আমি কি আপনার সঙ্গে আসতে পারি?'

'অবশ্যই পারেন।'

'কুড়ি হাজার টাকার পাথর দেখার লোভ হচ্ছে।'

'চলুন যাই।'

ম্যানেজার সাহেব টাকা গুনছেন। তারও টাকা গোনায় সমস্যা হচ্ছে। খুব সম্ভব তার মাথায় পাথর চেপে বসেছে।

ভিক্ষুক মেছকান্দর মিয়া আগের জায়গাতেই আছে। পাথরটাও ঠিক আগের জায়গায়। আমাদের দেখে এক চোখ মিট মিট করে তাকালো। আমি বললাম, 'মেছকান্দর মিয়া আমাকে চিনতে পারছেন?'

মেছকান্দর মিয়া জবাব দিল না। তার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। আমি বললাম, 'মনে নেই ঐ যে আপনার পাথর ধাক্কা খেয়ে আংগুলে ব্যথা পেলাম।'

'জ্বে মনে আছে।'

'আজ ক'জন ব্যথা পেয়েছে?'

'তা দিয়া আফনের কি প্রয়োজন?'

'প্রয়োজন কিছু নেই। কৌতূহল। তুমি বলবে না, তাই না?'

মেছকান্দর জবাব দিল না। সে এবং ম্যানেজার দু'জনই এখন তাকিয়ে আছে পাথরের দিকে। আমি বললাম, মেছকান্দর মিয়া তুমি কি এই পাথরটা আমার কাছে বিক্রি করবে? কি দাম চাও বল।

মেছকান্দর আবার আমার দিকে তাকালো। তার দৃষ্টিতে ভয় এবং সন্দেহ। আমি আবার বললাম, বল কত চাও?

মেছকান্দর বিড় বিড় করে বলল, পাথর বেচুম না।

আমি বললাম, সাধারণ একটা পাথর। এটা তো কোহিনুর না। আমি ভাল দাম দেব।

'জ্বি না সাব। পাথর বেচুম না। যত দামই দেন বেচুম না।'

'আমি নগদ টাকা সাথে করে নিয়ে এসেছি। একবার হ্যাঁ বল, আমি পাথর নিয়ে বাড়ি চলে যাই।'

'এক কথা ক'বার কমু। আমি পাথর বেচুম না।'

'কেন বেচবে না।'

'আমি পাথরের দোকানদারী করি না। আমি করি ভিক্ষা।'

'শোন মেছকান্দর। কুড়ি হাজার টাকা আমার শেষ অফার। কুড়ি হাজার টাকা থেকে এক পয়সা বেশি দিতে পারব না। তুমি বিবেচনা করে দেখ। ধর, সিগারেটটা ধরাও। সিগারেট টান দিয়ে ঠান্ডা মাথায় বিবেচনা কর।'

মেছকান্দর সিগারেট নিল। আমিই দেয়াশলাই দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দিলাম। মেছকান্দর এগিয়ে গেল পাথরের দিকে। আমি বললাম, 'কি মেছকান্দর বেচবে?'

'জ্বে না।'

'আমি কিন্তু চলে যাব, পেছন থেকে ডাকলে লাভ হবে না।'

মেছকান্দর চোখ-মুখ শক্ত করে বলল, 'লাখ টাকা দিলেও পাথর বেচুম না।'

আমি ম্যানেজারকে নিয়ে হাঁটা দিলাম। কিছুদূর গিয়ে ফিরে তাকালাম— মেছকান্দর পাথরের উপর বসে আছে। সিগারেট টানছে।

ম্যানেজার সাহেব বললেন, 'ঐ গাধা বোধহয় কুড়ি হাজার টাকা মানে কত টাকা সেটাই জানে না।'

আমি বললাম, 'হতে পারে। একশ পর্যন্ত সে হয়তো গুনতেই জানে না। কুড়িতে আটকে আছে। তার কাছে একশ হল পাঁচ কুড়ি।'

'কিংবা এও হতে পারে গাধাটা ভেবেচে এটা অনেক দামী জিনিস। ফাঁকি দিয়ে তার কাছ থেকে সস্তায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

'এটাও হতে পারে।'

ম্যানেজার সাহেব বললেন, 'আপনি কেন কুড়ি হাজার টাকায় এই পাথর

কিনতে চাচ্ছেন?'

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, 'এটা সাধারণ পাথর না। খুবই রহস্যময় পাথর।,

'কি রহস্য?'

'সেটা তো ম্যানেজার সাহেব বলা যাবে না। গুহ্য বিদ্যা বা বাতেনী জ্ঞান সর্ব সাধারণের জন্যে।'

'ভিক্ষুক মেছকান্দর মিয়া কি পাথরের রহস্যের কথা জানে?'

'জানতেও পারে। না জানলে সে তার ডেরায় ফেরার সময় এমন একটা ভারী পাথর বয়ে নিয়ে যায় কেন? ম্যানেজার সাহেব সিগারেট খাবেন?'

'জ্বি না, আমি ধূমপান করি না।'

'আপনাকে খুবই বিচলিত মনে হচ্ছে। শরীরে কিছু কাফিন ঢুকলে নার্ভ শান্ত হতে পারে।'

ম্যানেজার সাহেব সিগারেট নিলেন। সিগারেট ধরালেন। প্রথম টান দিচ্ছেন। তার নার্ভ শান্ত হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। ঘাড়ের রগ ফুলে উঠেছে। চোখ-মুখ শক্ত।



ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশও হতে পারে, আবার পঞ্চাশ পাঁচ পঞ্চাশও হতে পারে। রোদে জ্বলে যাওয়া চেহারা। মনে হয় দীর্ঘদিন ক্যানভাসারের চাকরি করেছেন— রোদে রোদে ঘুরেছেন। ক্যানভাসারদের মতই ধূর্ত চোখ। সারাক্ষণই ইঁদুরের মত চোখের মণি নড়ছে। চোখই বলে দিচ্ছে, মানুষটা অস্থির প্রকৃতির। গলার স্বর ভারী। আমার ধারণা, যে স্বরে উনি এখন কথা বলছেন সেই স্বরটা আসল না, নকল। বিশেষ বিশেষ কথা বলার সময় ভদ্রলোক সম্ভবত গলার স্বর বদলান।

তিনি আমার দিকে খানিকটা ঝুঁকে এলেন। গলার ভারী স্বর আরো ভারী করলেন। প্রায় ফ্যাস্‌ফেসে গলায় বললেন, 'বুঝলেন ভাই সাহেব, আপনাকে একজন জন্মান্ধ জোগাড় করতে হবে। তাকে দিয়ে লোকালয়ের বাইরে অমাবশ্যার রাত্রিতে একটা লাউগাছের বিচি পুঁততে হবে। বিচি পোঁতার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে ছড়িয়ে দিতে হবে কুমারী কন্যার ঋতুকালীন নষ্ট রক্ত। সেই কুমারী কন্যাকেও হতে হবে জন্মান্ধ!'

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, 'আপনার দেখি জন্মান্ধেরই কারবার।'

ভদ্রলোক আহত গলায় বললেন, 'আমাকে কথা শেষ করতে দিন। মাঝখানে কথা বললে হবে কিভাবে? আপনার যদি কিছু বলার থাকে আমি কথা শেষ করি তারপর বলবেন।'

আমি আবারো হাই তুলতে তুলতে বললাম, 'জ্বি আচ্ছা।'

আমার এবারের হাইটা ছিল নকল। ভদ্রলোককে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা যে তাঁর জন্মান্ধ বিষয়ক গল্প শুনতে ইচ্ছা করছে না। ভদ্রলোক এই সহজ সত্য ধরতে পারছেন না। তিনি গল্প শুনিয়ে ছাড়বেন।

'এরপর আপনাকে যা করতে হবে তা হচ্ছে প্রতিদিন খালি পায়ে স্রোতস্বিনী নদী থেকে মাটির পাত্রে এক পাত্র করে পানি আনতে হবে। পানি আনার কাজটা করতে হবে মধ্যরাতে।'

'ও আচ্ছা।'

'পানি আনতে হবে উলঙ্গ অবস্থায়। তখন গায়ে কোন কাপড় থাকলে চলবে না। সেই পানি দিয়ে প্রতি রাতেই লাউ গাছের বীজ যে জায়গায় পুঁতেছেন, সেই জায়গাটা ভিজিয়ে দিতে হবে। যতদিন না বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্‌গম না হচ্ছে।'

আমি আগ্রহশূন্য গলায় বললাম, 'ইন্টারেস্টিং।'

ভদ্রলোক আরো খানিকটা ঝুঁকে এলেন। আমি লক্ষ্য করলাম, ভদ্রলোকের গলা অন্য মানুষদের গলার চেয়ে লম্বা। তাঁর শরীরটা আগের জায়গাতেই আছে কিন্তু গলা লম্বার কারণে মাথাটা এগিয়ে এসেছে।

'অঙ্কুরোদ্‌গমের পর থেকে লাউগাছে প্রথম ফুল আসা পর্যন্ত আপনাকে ঠিক সন্ধ্যাবেলা হযরত মূসা আলায়হেস সালামের মায়ের সতেরোটা নাম পড়ে গাছে ফুঁ দিতে হবে।'

'সতেরোটা নাম আমি পাব কোথায়?'

'আপনাকে আমি লিখে দিচ্ছি। এক্ষুনি লিখে দিচ্ছি।'

'থাক, দরকার নেই।'

'দরকার নেই কেন?'

'কাগজ আমি রাখব কোথায়? আমার পাঞ্জাবীর পকেট নেই।'

ভদ্রলোক আহত গলায় বললেন, 'আপনি মনে হয় আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছেন না। ঘন ঘন হাই তুলছেন। অবশ্যি বিশ্বাস করা কঠিন।'

আমি হাসিমুখে বললাম, 'বিশ্বাস করছি। প্রতিটি শব্দ বিশ্বাস করছি। কারণ বিশ্বাসে মিলায় বস্তু — তর্কে বহুদূর।'

'মন্ত্রতন্ত্রের কথা আমি কাউকে বলি না। মানুষের মনে ঢুকে গেছে অবিশ্বাস। অবিশ্বাসীদের এইসব বলে লাভ নেই। আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে বলে বলছি। তাছাড়া আমি বেশিদিন বাঁচব না। সারাজীবনের সঞ্চয় কিছু মন্ত্র-তন্ত্র কাউকে দিয়ে যেতে চাই। আরেক কাপ চা খাবেন?'

'জ্বি না।'

'খান, আরেক কাপ খান। চায়ের সঙ্গে কোন নাশতা দেব? মুড়ি আছে? মুড়ি মেখে দিতে বলি?'

'বলুন।'

ভদ্রলোক বাড়ির ভেতর ঢুকে গেলেন। আমি বসে আছি অন্ধকারে। আমার সামনে এতক্ষণ একটা হারিকেন ছিল। ভদ্রলোক ভেতরে ঢোকার সময় হারিকেন নিয়ে গেছেন। ঢাকায় বিখ্যাত লোড শেডিং শুরু হয়েছে। দু'ঘন্টার আগে ইলেকট্রিসিটি আসবে না। এখন শীতকাল গরম লাগার কথা না। কিন্তু গরমে শরীর ঘেমে গেছে। ইলেকট্রিসিটি এলেও এই গরমের হাত থেকে বাঁচা যাবে না।

কারণ বসার ঘরে ফ্যান নেই। ভদ্রলোক গল্প করার সময় প্রবলবেগে হাওয়া করছিলেন। তিনি ভেতরে ঢোকার সময় হারিকেনের সঙ্গে হাতপাখাও নিয়ে গেছেন।

ভদ্রলোকের আচার-আচরণের মধ্যে কিছু মজার ব্যাপার আছে — ভেতরের বাড়িতে ঢুকলে সহজে বের হতে চান না। মুড়ির কথা বলে ভেতরে ঢুকেছেন, আর বের হচ্ছেন না। কখন বের হবেন কে জানে।

ইনিই আমাদের মুহাম্মদ ইয়াকুব। বাবা — সুলায়মান, গ্রাম — নিশাখালি, জেলা — নেত্রকোনা। ভদ্রলোক কবিরাজ হলেও কথাবার্তায় মনে হচ্ছে মন্ত্র-তন্ত্র যাদু-টোনার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ।

ইয়াকুব সাহেব আমাকে খানিকটা পছন্দ করেছেন বলে মনে হচ্ছে। আজ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার তৃতীয় দফা সাক্ষাৎ। এর মধ্যেই তিনি আমাকে অদৃশ্য হবার মন্ত্র শেখাচ্ছেন। অবশ্যি এটা তাঁর কোন একটা কৌশলও হতে পারে। ধূর্ত মানুষদের নানান ধরনের কৌশল থাকে। মন্ত্র-তন্ত্রের কথা বলে আমাকে অভিভূত করার চেষ্টা করছেন। আমি অভিভূত হচ্ছি না। এ ব্যাপারটাও সম্ভবত ভদ্রলোকের মনোবেদনার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ইয়াকুব সাহেব এক হাতে মুড়ির বাটি এবং হারিকেন অন্য হাতে কাপড়ের ব্যাগ নিয়ে ঢুকলেন।

'ইলেকট্রিসিটি আজ বোধহয় আসবেই না। নিন, মুড়ি খান। খেয়ে অবশ্যি আরাম পাবেন না — মুড়ি ন্যাতন্যাতা হয়ে গেছে। টিন ভাল করে বন্ধ করেনি। বাতাস ঢুকে মুড়ি মরা মরা হয়ে গেছে।'

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, মরা মুড়ি জীবিত করার কোন মন্ত্র নেই? মন্ত্র পড়ে তিনবার ফুঁ দিলেন, মুড়ি তাজা হয়ে গেল।

ভদ্রলোক দুঃখিত চোখে তাকিয়ে রইলেন। আমি মুড়ি চাবাতে চাবাতে বললাম, 'ঠাট্টা করছিলাম।'

ইয়াকুব সাহেব শীতল গলায় বললেন, 'মন্ত্র বিশ্বাস করা-না-করা আপনার ইচ্ছা। কিন্তু মন্ত্র নিয়ে ঠাট্টা করবেন না। মন্ত্র হল বিচিত্র ধ্বনির কিছু শব্দ। শব্দ তুচ্ছ করার বিষয় নয়। আদিতে কিছুই ছিল না। আদিতে ছিল মহাশূন্য। তারপর একটা শব্দ হল — "বিগ বেং।" তৈরি হল বিশ্বব্রহ্মান্ড। কাজেই সৃষ্টির মূলে আছে শব্দ।

আমি বললাম, 'আপনার কাপড়ের ব্যাগে কি?'

'আপনাকে একটা জিনিস দেখাবার জন্যে এনেছিলাম — মানুষের একটা কঙ্কাল, নরমুণ্ড।'

'দেখুন।'
'আপনি অবিশ্বাসী টাইপ মানুষ। আপনাকে দেখানো না-দেখানো সমান। সত্যিকার কোন জহুরীর হাতে পড়লে সে লাফিয়ে উঠত।'
'বিশেষ ধরনের নরমুণ্ড?'
'খুব লক্ষ্য করে দেখুন, আপনার কাছে বিশেষ ধরনের মনে হয়, নাকি সাধারণ মনে হয়।'
আমি বিশেষ কিছু দেখলাম না। সাইজে ছোট একটা নরমুণ্ডু। স্কাল সাদা থাকে। এটা একটু কালচে হয়ে আছে— মনে হয় অনেকদিনের পুরানো।
'বিশেষ কিছু বুঝতে পারছেন না?'
'জ্বি না।'
'অক্ষিকোটর দু'টা থাকে— এর যে তিনটা সেটা বুঝছেন?'
আমি দেখলাম কপালেও একটা ফুটো। সেই ফুটাকে অক্ষিকোটর মনে করার কারণ নেই। হয়ত অন্য কোন কারণে ফুটো হয়েছে। কপালে গুলি খেলে কপাল ফুটো হবার কথা।
'আপনি বলতে চাচ্ছেন জীবিত অবস্থায় এই মানুষটার তিনটা চোখ ছিল?'
ইয়াকুব সাহেব নরমুণ্ডু থলিতে ভরতে ভরতে বললেন, 'সব মানুষেরই তিনটা চোখ থাকে। দু'টা দৃশ্যমান, একটা অদৃশ্য।'
'ও আচ্ছা।'
ইলেকট্রিসিটি চলে এসেছে। আমি বললাম, 'ইয়াকুব সাহেব, আমি উঠি।'
ইয়াকুব সাহেব আমাকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। অতি বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, 'একদিন এসে আমার সাথে চারটা খানা খান। দরিদ্র মানুষ বেশি কিছু খাওয়াতে পারব না। মটরশুটি দিয়ে শিং মাছের ঝোল আর ভাত। কবে খাবেন বলুন।'
'আগামী সপ্তাহে আসি?'
'জ্বি আচ্ছা, আসুন।' আপনার মোটা বন্ধুকেও নিয়ে আসবেন। উনার জন্যে একটা অষুধ বানিয়ে রাখব। খেলে ক্ষুধা কমে যাবে। অতি সুখাদ্যেও অরুচি হবে।
'টেবলেট জাতীয় কিছু?'
'জ্বি। ফার্মেসীর ট্যাবলেট না— বড়ি জাতীয়। সকাল-বিকাল দু'বেলা সেব্য।'
'বড়ি খেলে ক্ষিধে লাগবে না!'
'জ্বি না।'
'এই ক্ষুধা মুক্তি ট্যাবলেট তো সারা বাংলাদেশের মানুষের জন্যে দরকার। তৈরি আছে? থাকলে দু'টা দিন নিয়ে যাই— ট্রাই করে দেখি।'

'জ্বি না, তৈরি নেই।'
'তৈরি করে রাখুন। টেবলেটটির নাম কি?'
'কোন নাম দেইনি।'
'নাম দিন ইয়াকুবের ক্ষুধামুক্তি বড়ি।'
'আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না। তাই না?'
আমি জবাব না দিয়ে হাঁটা ধরলাম। ফাতেমা খালা সিঙ্গাপুর থেকে ফিরেছেন কিনা খবর নেয়া দরকার।

খালা বাড়িতে নেই। তিনি তাঁর আর্কিটেক্টের কাছে গিয়েছেন। বাড়িতে যে সোয়ানা বসবে তার ডিজাইন নিয়ে কথা বলবেন। পুরানো ডিজাইন তাঁর পছন্দ হচ্ছে না। ফলস সিলিং অনেক উচুঁতে হয়েছে। আরো নিচু হওয়া দরকার। সোয়ানার ঘরে দমবন্ধ দমবন্ধ ভাবটা আসল। তামান্না আমাকে বসতে দিল। তার আচার-আচরণ স্বাভাবিক। মনে হচ্ছে আজই তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। আমি চাইবার আগেই লম্বা গ্লাস ভর্তি সবুজ রঙের কি এক সরবত এনে দিল। সরবতের গ্লাসে বরফের কণা ভাসছে। আমি চুমুক দিতে দিতে বললাম, 'জামান ভাল আছে?'
তামান্না বিস্মিত হয়ে বলল, 'জামান কে?'
'আপনার ছোট ভাই রিকশা থেকে পড়ে যে ব্যথা পেয়েছিল।'
'ও আচ্ছা। হ্যাঁ, জামান ভাল আছে। তার রিকশা থেকে পড়ে ব্যথা পাওয়ার কথা আপনাকে কে বলেছে?'
'আপনার ম্যাডাম বলেছেন।'
'যে আপনাকে যা বলে তাই আপনি মনের ভেতর ঢুকিয়ে রেখে দেন?'
'সবাই তাই করে।'
'সবাই তাই করে না। আপনি অন্য সবার মত না।'
'আমি আলাদা?'
'হ্যাঁ আলাদা, তবে ভাল অর্থে আলাদা না, মন্দ অর্থে আলাদা। আপনার সমস্ত জীবন এবং কর্মকান্ড জুড়ে আছে ভান। মিথ্যা রহস্যের ধোঁয়া সৃষ্টি করে আপনি তার মধ্যে বাস করতে ভালবাসেন। কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে আপনি পাথর কিনতে গিয়েছিলেন। যাননি?'
'হুঁ।'
'যার পাথর সে বিক্রি করল না, কারণ আপনি এমনই এক রহস্যের কুয়াশা তার সামনে তৈরি করলেন যে সে ভাবল না জানি এটা কি পাথর। কাজটা

আপনি করলেন ম্যানেজার সাহেবের সামনে কারণ আপনি একই সঙ্গে তাকেও ভড়কে দিতে চেয়েছেন— তাই না!'

'হ্যাঁ। উনি কি ভড়কেছেন?'

'যথেষ্ট ভড়কেছেন। গতকাল অনেকক্ষণ তিনি আমার সঙ্গে ঝুলিঝুলি করেছেন পাথরটা দেখে আসার জন্যে।'

'আপনি কি দেখে এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

আমি আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'পাথরটা হাত দিয়ে ছুঁয়েছেন?'

'হাত দিয়ে ছোঁব কেন?'

'হাত দিয়ে ছুঁলেই একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হত। ইলেকট্রিক শকের মত একটা শক খেতেন। নেকস্ট টাইম যখন যাবেন হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখবেন।'

তামান্না একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি আরাম করে সরবত খাচ্ছি। সরবতে কেমন লজেন্স লজেন্স গন্ধ। অতিরিক্ত মিষ্টি। অতিরিক্ত মিষ্টিটা মনে হয় এই সরবতের জন্যে প্রয়োজন। মিষ্টি কম হলে ভাল লাগত না।

'হিমু সাহেব!'

'জ্বি।'

'পাথরটা হাত দিয়ে ছুঁয়ে দিলে আমি চারশ ভল্টের শক খাব?'

'চারশ ভোল্টের শক খাবেন না— মৃদু ধাক্কার মত লাগবে।'

'আপনি আমাকে নিয়েও রহস্য তৈরি করবেন না। প্লীজ। সরবত খাচ্ছেন— খান। আমি খুব দুঃখকষ্টে মানুষ হয়েছি। যারা দুঃখকষ্টে মানুষ হয় তারা এত সহজে বিভ্রান্ত হয় না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে মানুষ হিসেবে আমি কখনো বোকা ছিলাম না।'

আমি সরবতের গ্লাসে লম্বা চুমুক দিয়ে বললাম, 'ফাতেমা খালার ফিরতে মনে হয় দেরি হবে। আমি উঠি?'

তামান্না কঠিন গলায় বলল, 'না আপনি উঠবেন না। ম্যাডাম আমাকে বলে গেছেন আপনি যদি আসেন আপনাকে যেন আটকে রাখা হয়। লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে বসতে পারেন— বইটই পড়লে সময় কাটবে।'

আমি বললাম, আপনার ম্যাডাম নিশ্চয়ই আপনাকে বলেননি আমাকে লাইব্রেরী ঘরে নিয়ে বসাতে। আমার ধারণা তিনি আপনাকে বলে গেছেন আমার সঙ্গে গল্প-গুজব করতে। তাই না!'

'হ্যাঁ তাই। বেশ আপনি গল্প করুন, আমি শুনছি।'

'রূপকথা শুনবেন?'

'যা শুনাবেন তাই শুনব।'

আমি বেশ কায়দা করে গল্প শুরু করলাম। যে কোন কারণেই হোক তামান্না মেয়েটি আমার উপর অসম্ভব বিরক্ত। বিরক্তিটা এই পর্যায়ে যে সে আমার দিকে তাকাতেও পারছে না। সে গল্প শুনছে খুবই অনাগ্রহ এবং অনিচ্ছায়।

তিন জেলে গিয়েছে মাছ মারতে। সাগরে জাল ফেলেছে। জালে ধরা পড়ল এক মৎস্যকন্যা, মারমেইড। মৎস্য কন্যা বলল, 'তোমাদের আল্লাহর দোহাই লাগে তোমরা আমাকে মের না। আমাকে সাগরে ফেলে দাও, তার বদলে তোমাদের প্রত্যেকের একটা করে ইচ্ছা আমি পূর্ণ করব। তবে আমি তো আর আলাদীনের জ্বিনের মত ক্ষমতাবান না— আমার ক্ষমতা সীমিত। আমি টাকা পয়সা ধনদৌলত দিতে পারব না।'

প্রথম জেলে বলল, 'আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি আমার বুদ্ধি বাড়িয়ে দাও। এখন যে বুদ্ধি আমার আছে তা ডাবল করে দাও।'

মৎস্য কন্যা বলল, 'ডাবল করা হল।'

প্রথম জেলে সঙ্গে সঙ্গে বুঝল তার বুদ্ধি বেড়েছে।

দ্বিতীয় জেলে বলল, একজন যখন বুদ্ধি নিয়েছে তখন আমিও বুদ্ধিই নেব। তবে ডাবল না আমার বুদ্ধি তিনগুণ করে দাও।' মৎস্য কন্যা বলল, 'তিনগুণ করা হল।'

তৃতীয় জেলে বলল, 'আমিও বুদ্ধিই চাই তবে চাই দশগুণ।'

মৎস্যকন্যা বলল, 'খবর্দার, এইটি করবে না। দশগুণ বুদ্ধি তোমাকে দেয়া হলে তুমি বিপদে পড়বে।'

'বিপদে পড়া না পড়া আমার ব্যাপার। তোমার কাছে দশগুণ বুদ্ধি চেয়েছি, তুমি বুদ্ধি দাও।'

'এখনো সময় আছে ভেবে দেখ।'

'ভাবাভাবির কিছু নাই।'

মৎস্যকন্যা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আচ্ছা যাও, তোমাকে দশগুণ বুদ্ধি দেয়া হল। আর সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় জেলে একটা মেয়ে হয়ে গেল।,

তামান্না বলল, 'আপনি বলতে চাচ্ছেন যে মেয়েদের বুদ্ধি পুরুষদের চেয়ে দশগুণ বেশি?'

'হ্যাঁ।'

'এই গল্পটা কি আপনি আমাকে খুশি করার জন্যে বললেন?'

'আপনাকে খুশি করার একটা প্রচ্ছন্ন ইচ্ছা আমার ছিল তবে গল্পটা আমি বিশ্বাস করি।'

তামান্না নড়ে চড়ে বসল। এবং আমাকে হঠাৎ খুবই বিস্মিত করে দিয়ে বলল, 'হিমু সাহেব, শুনুন। ম্যাডাম চলে আসার আগে আপনাকে খুব জরুরী কিছু কথা বলি, দয়া করে মন দিয়ে শুনুন। আপনার বুদ্ধিও মেয়েদের মতই দশগুণ বেশি। তবে এই বুদ্ধিতে কাজ হবে না। আমি আপনাকে পছন্দ করি না। আমি যাদেরকে পছন্দ করি না তাদের সে ব্যাপারটা বুঝতে দেই না। বরং এমন ভাব করি যাতে তারা বিভ্রান্ত হন। তারা মনে করেন আমি তাদের খুবই পছন্দ করি। আপনার বেলায় ব্যতিক্রম করলাম। আমি যে আপনাকে অপছন্দ করি সেটা জানিয়ে দিলাম।'

'কেন?'

'আপনার সঙ্গে অস্পষ্টতা রাখলাম না।'

'আপনি আপনার ম্যাডামকে খুবই অপছন্দ করেন তাই না?'

'হ্যাঁ উনাকে অপছন্দ করি। বোকা মানুষ আমার পছন্দ না। আপনার খালা মেয়ে হয়েও বোকা। মৎস্যকন্যার গল্প আপনার খালার ক্ষেত্রে কাজ করছে না। যে কারণে আমার অপছন্দের ব্যাপারটা উনাকে জানতে দেইনি। কারণ উনার সাহায্য আমার দরকার। আমি বিশাল সংসার নিয়ে বিপদে পড়ে গেছি।'

তামান্না বেশ সহজ এবং স্বাভাবিক ভঙ্গিতে আমার সামনে বসে আছে। দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছি। মনে হচ্ছে আমাদের সামনে অদৃশ্য একটা দাবার সেট। দাবা খেলা হচ্ছে। আমি তাকে কিস্তি দিয়ে দিলাম। কিস্তি কাটান দিয়ে সে উল্টো কিস্তি দিয়েছে। ঘোড়ার কিস্তি। এক সঙ্গে রাজা এবং মন্ত্রী ধরা পড়েছে। রাজা বাঁচাতে হলে আমাকে মন্ত্রী বিসর্জন দিতে হবে। রাজা না বাঁচিয়ে মন্ত্রী বাঁচালে কেমন হয়। খেলা শেষ হয়ে যায়। তাতে কি, মন্ত্রীর মত শক্তিশালী ঘুঁটি তো বেঁচে রইল। আমি রাজা বিসর্জন দেবার ব্যবস্থা করলাম। কোমল গলায় বললাম, 'তামান্না, আপনি বোধহয় জানেন না, আমি আপনাকে খুবই পছন্দ করি। আপনার মত পছন্দ এই জীবনে আরেকটি মেয়েকে করেছিলাম তার নাম রূপা।'

তামান্না আমার কথায় মোটেই চমকাল না। সে কঠিন মুখে বলল, 'প্লীজ আপনি মিথ্যা কথা বলবেন না। আপনি এই দীর্ঘ জীবনে কাউকে পছন্দ করেননি। ভবিষ্যতেও কাউকে পছন্দ করবেন বলে মনে হয় না। পৃথিবীতে কিছু কিছু খুব দুর্ভাগা মানুষ জন্মগ্রহণ করে। তারা কাউকে ভালবাসতে পারে না। আপনি সেই সব দুর্ভাগা মানুষদের একজন।'

আমি বললাম, 'ও আচ্ছা।'

'আপনি মহাপুরুষ সেজে পথে পথে হাঁটেন — সেটাই আপনার জন্যে ভাল।'

আমি আবারো বললাম, 'ও আচ্ছা।'

তামান্না দীর্ঘ কোন বক্তৃতার জন্যে তৈরি হচ্ছিল — নিজেকে সামলে নিল কারণ ফাতেমা খালা এসে পড়েছেন। তাঁকে খুবই উত্তেজিত মনে হচ্ছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'কেমন আছিস হিমু?'

'ভাল।'

'আরো আগে চলে আসতাম, বুলবুল পাথরটার কথা বলল। ভাবলাম ঠিক আছে দেখেই যাই। পাথর দেখে এসেছি।'

'হাত দিয়ে ছুঁয়েছ?'

'হুঁ। হিমু তুই বললে বিশ্বাস করবি না— হাত দিয়ে ছোঁয়ামাত্র ইলেকট্রিক শকের মত শক খেলাম। মনে হল পাথরটা জীবন্ত। আমার গায়ের সব লোম খাড়া হয়ে গেল।'

আমি তামান্নার দিকে তাকালাম। তামান্না আমার দৃষ্টি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে কিশোরীদের মত ছটফটে গলায় বলল, 'ম্যাডাম, আপনি একা গিয়ে দেখে এলেন আমাকে নিলেন না। আমিও পাথরটা ছুঁয়ে দেখতাম।'

ফাতেমা খালা বললেন, 'পাথর গিয়ে দেখার দরকার নেই। পাথরটা আমি কিনব। যত টাকা লাগে কিনব। গাড়িতে আসতে আসতে মন স্থির করেছি। হিমু, তোর উপর দায়িত্ব হচ্ছে পাথরটা কেনার ব্যবস্থা করা। তোকে আমি তার জন্যে আলাদা কমিশন দেব। কেনার ব্যবস্থা করতে পারবি না?'

'পারব।'

'বুলবুল বলছিল তুই নাকি এই পাথরটার বিষয়ে জানিস। পাথরটার ক্ষমতা কি বল দেখি।'

'খালা এটা হল ইচ্ছাপূরণ পাথর। পাথরে হাত দিয়ে যা চাইবে তাই পাবে।'

'সত্যি বলছিস, না ঠাট্টা করছিস।'

'সত্যি বলছি।'

'তোর মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুই ঠাট্টা করছিস। ঠাট্টা করলেও কিছু যায় আসে না— পাথরটা আমার দরকার। তুই এক কাজ কর এক্ষুনি যা পাথরটা নিয়ে আয়। পাজেরো গাড়িটা নিয়ে যা— মালিক শুদ্ধ নিয়ে আসবি। পাথরের দাম যা ঠিক হয় আমি দিয়ে দেব।'

'ইয়াকুব সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছে। আমি এক কাজ করি, গাড়ি করে না হয় ইয়াকুব সাহেবকে নিয়ে আসি। পাথর আরেকদিন আনব।'

'ইয়াকুব পালিয়ে যাচ্ছে না। তুই পাথর আগে নিয়ে আয়। পাথরের সত্যি সত্যি ক্ষমতা আছে কিনা সেটা আজ রাতেই টেস্ট করব।'

আমি আড়চোখে তামান্নার দিকে তাকালাম। তার ঠোঁটের কোণায় মোনালিসা স্টাইল হাসি।

খালা তামান্নাকে বললেন, 'তামান্না তুমি একটু এই ঘর থেকে যাও। আমি হিমুকে কিছু পার্সোনাল কথা বলব।'

তামান্না চলে গেল। খালা গলার স্বর খাদে নামিয়ে বললেন, 'মেয়েটাকে ইচ্ছা করে রেখে গিয়েছিলাম যাতে দু'জনের মধ্যে পরিচয়টা গাঢ় হয়। মেয়েটাকে কেমন লাগছে?'

'খুব ভাল।'

'কি রকম সরল মেয়ে দেখেছিস? জগতের কোন জটিলতা এই মেয়ে ধরতে পারে না। আর আমাকে যে কি পছন্দ করে। আমার নিজের কোন মেয়ে থাকলে সেও আমাকে এত পছন্দ করত না। এই যে আমি তাকে ছাড়া পাথর দেখে এসেছি তার জন্যে সে কেমন মন খারাপ করে দেখেছিস? আর একটু হলে কেঁদে ফেলত। তাই না?'

'হুঁ।'

'চোখ ছল ছল করছিল কিনা তুই বল।'

'ছল ছল মানে আরেকটু হলেই টপটপাত্তি পানি পড়া শুরু হত।'

'আমি যদি এখন তাকে বলি, তামান্না আমি চাই তুমি হিমুকে বিয়ে কর, সে কোনদিকে তাকাবে না, তুই যে একটা প্রথম শ্রেণীর ভ্যাগাবন্ড, চাকরি বাকরি নেই, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াস এইসব নিয়েও ভাববে না। চোখ বন্ধ করে বিয়ে করবে।'

'তাহলে বলে ফেল। ফেলছ না কেন? 'ধর তক্তা মার পেরেক' ঝামেলা শেষ করে দাও।'

'আমি বলব না। আমি চাই মেয়েটা যেন নিজ থেকে তোর প্রতি আকৃষ্ট হয়। সে নিজেই যদি তোকে পছন্দ করে ফেলে তাহলে আর আমাকে পরে দোষ দিতে পারবে না। আমি অবশ্যি তামান্নার ব্রেইন ওয়াস করে ফেলেছি— তোর সবক্ষেত্রে তোর সম্পর্কে বানিয়ে বানিয়ে অনেক মিথ্যা কথা বলি।'

'খালা মেনি থ্যাংকস।'

'তুই একটা কাজ করবি, মেয়েটাকে নিয়ে ভাল কোন রেস্টুরেন্টে খেতে যাবি। আমি খরচা দেব। মেয়েরা রেস্টুরেন্টে খেতে পছন্দ করে।'

'ভাল কোন রেস্টুরেন্টে তো খালি পায়ে আমাকে ঢুকতেই দেবে না।'

'গাধার মত কথা বলিস না তো, তোকে স্যান্ডেল, পাঞ্জাবী এইসব কিনে দিয়েছি না। ফিটফাট হয়ে যাবি। আরেকটা কথা, রেস্টুরেন্টের বয় বাবুর্চির সঙ্গে

রসিকতা করবি না। লোয়ার লেভেলের লোকজনদের সঙ্গে রসিকতা মেয়েরা একদম পছন্দ করে না।'

'কোথায় পড়েছ রিডার্স ডাইজেস্টে?'

'মনে নেই কোথায় পড়েছি। তুই এক কাজ কর — আগামীকালই যা। গুলশানে একটা রেস্টুরেন্ট আছে তন্দুরী খুব ভাল করে। আমার কাছে ওদের কার্ড আছে, তোকে দিচ্ছি। একটু বোস কার্ডটা নিয়ে আসি।'

'কার্ডটা কাল নেই।'

'কাল ভুলে যাব। আজই নিয়ে যা।'

আমি তন্দুর হাউসের কার্ড এবং পাজেরো গাড়ি নিয়ে বের হলাম। ভিক্ষুক মেছকান্দর সাহেবকে পাওয়া গেল না। পাজেরো ড্রাইভারকে বললাম, 'চলুন শহরে ঘুরে বেড়াই। ভিক্ষুক খুঁজে বেড়াই।'

পাজেরো ড্রাইভার খুবই বিরক্ত হল। পুরো দু'ঘন্টা শহরে ঘুরলাম। তারপর গেলাম শহরের বাইরে। সাভার স্মৃতিসৌধ দেখে এলাম। স্মৃতিসৌধ দেখা হবার পর ড্রাইভার বলল, 'আর কোথায় যাবেন?'

আমি বললাম, 'জাপান বাংলাদেশ মৈত্রী সেতুতে চল। সেতুটা দেখা হয়নি।'

'গাড়িতে তেল নেই। তেল নিতে হবে। ফুয়েলের কাঁটা মাঝামাঝি জায়গায় আছে, সে বলছে তেল নেই। আমি মধুর গলায় বললাম, 'তেল ছাড়াই গাড়ি চলবে। আমি সাধু মানুষ, মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিয়ে দিচ্ছি। বিনা তেলেই গাড়ি চলবে। তুমি তেল বিষয়ক কোন চিন্তাই মাথায় স্থান দিও না।'

'আপনি সত্যি সত্যি জাপান-বাংলাদেশ সেতু দেখতে যাবেন?'

'অবশ্যই। পাকিস্তান-বাংলাদেশ বৈরী সেতু থাকলে ভাল হত। সেটাও দেখে আসতাম। নাই যখন জাপান-বাংলাদেশ মৈত্রী সেতুই সই।'

'চলেন।'

আমি চোখ বন্ধ করে গম্ভীর ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ বিড় বিড় করে গাড়ির ডেসবোর্ডে দু'টা ফুঁ দিয়ে দিলাম। ড্রাইভারের নিশ্চয়ই পিত্তি জ্বলে গেল।

জাপান-বাংলাদেশ মৈত্রী সেতু দেখে ফিরতে ফিরতে রাত দশটা বেজে গেল। গাড়ি যখন সঙ্গে আছে ব্যাঙাচির বাসা খুঁজে বের করলে কেমন হয়। ড্রাইভারকে বললাম বাসাবোর দিকে যেতে। জীপের ড্রাইভার ভয়ংকর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাচ্ছে। তার পাশের সীটে বসে না থেকে আমি যদি রাস্তায় থাকতাম সে নির্ঘাৎ আমাকে চাপা দিত।

'ড্রাইভার!'

'জ্বি।'

'তেল ছাড়া শুধু ফুঁয়ের উপর গাড়ি কেমন চলছে দেখেছ?'

'রিজার্ভে সামান্য তেল ছিল তাই দিয়ে চলেছে। আর চলবে না।'

'চলবে না মানে? আবারো ফুঁ দিয়ে দেব— আবারো চলবে, ময়মনসিংহ থেকে ঘুরে আসতে পারব।'

'ময়মনসিংহ যাবেন?'

'জ্বি।'

'ময়মনসিংহে কি?'

'কিছু না। আমার ফুঁয়ের জোর পরীক্ষা করা।'

ড্রাইভার গম্ভীর হয়ে গেল। আমি খুঁজে খুঁজে ব্যাঙাচির বাড়ি বের করলাম। ছোট একতলা বাড়ি। গাছপালায় ভর্তি। আমি পাজেরো ড্রাইভারকে বললাম, 'বেশিক্ষণ না। আমি ঘন্টা খানিক থাকব — তারপর ময়মনসিংহ। তুমি অপেক্ষা কর। আমার সঙ্গে টাকা পয়সা থাকে না, কাজেই চা খাওয়ার টাকা দিতে পারছি না। পেট্রল বেচে চা নাশতা করতে পার। সমস্যা নেই।'

ব্যাঙাচি বাসায় ছিল না। তার স্ত্রী খুবই কৌতূহলী হয়ে আমাকে কিছুক্ষণ দেখলেন। তারপর সহজ গলায় বললেন, 'ভেতরে এসে বসুন। ও এসে পড়বে।'

ভদ্রমহিলা অসম্ভব রোগা। তাঁর চোখ জ্বল জ্বল করছে কিংবা চশমার কাচ জ্বল জ্বল করছে। প্রফেসর প্রফেসর চেহারা। বয়সকালে রূপবতী ছিলেন। সেই রূপ পুরোপুরি চলে যায়নি। ভদ্রমহিলার গলার স্বর খুবই কোমল। তিনি বললেন, 'আপনার নাম হিমু?'

'জ্বি?'

'ও আপনার কথা আমাকে বলেছে। আপনি নাকি ওর স্কুল জীবনের বন্ধু। ওর কোন বন্ধু-বান্ধব বাসায় আসে না। আপনাকে দেখে সেই জন্যেই খুব অবাক হয়েছি। দাঁড়িয়ে আছেন কেন, বসুন।'

আমি বসলাম। ভদ্রমহিলা বললেন, 'চা দিতে বলি? চায়ে চিনি দুধ খান তো?'

'জ্বি খাই।'

ভদ্রমহিলা ভেতরে চলে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ঢুকলেন। আমার জীবনে কোন বাড়িতে এত দ্রুত কাউকে চা দিতে দেখিনি। ভদ্রমহিলা হাসি মুখে বললেন, 'আমার ঘন ঘন চা খাবার অভ্যাস। ফ্লাক্স ভর্তি করে চা বানিয়ে রাখি। সেখান থেকেই আপনাকে দিলাম।'

'থ্যাংক য়্যু।'

'কিছু মনে করবেন না। আপনাকে শুধু চা দিতে হল। ঘরে কোন খাবার নেই। ইচ্ছা করেই খাবার রাখি না। খাবার যেখানেই থাকুক ও খুঁজে বের করে খেয়ে ফেলে।'

আমি কিছু বললাম না। চায়ে চুমুক দিলাম। ফ্লাক্সে রাখা চা কখনো খেতে ভাল হয় না। এই চাটা ভাল হয়েছে।

'আপনার বন্ধুর খাই খাই স্বভাবের সঙ্গে তো আপনার পরিচয় আছে। আছে না!'

'জ্বি আছে।'

'ও সবকিছু খেতে পারে। একবার বড় গ্লাসে এক গ্লাস সোয়াবিন তেল নিয়ে লবণ মিশিয়ে খেয়ে ফেলেছিল। ও হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর কুম্ভকর্ণ। কুম্ভকর্ণ কে তা জানেন?'

'জ্বি না।'

'কুম্ভকর্ণ হল রাবণের মেঝো ভাই। তার মা'র নাম কৈকেয়ী। কুম্ভকর্ণের ক্ষুধা কখনো মিটতো না। এমন জিনিস নেই যে সে খেত না। সাধু সন্ন্যাসী, ঋষি সবই খেয়ে ফেলতো।'

'ও আচ্ছা।'

'তার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ব্রহ্মা তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। সে ছয় মাস ঘুমাত। তারপর একদিন জাগত। আবার ছ' মাসের জন্যে ঘুমিয়ে পড়ত। এই জন্যেই তার নাম কুম্ভকর্ণ। আপনার বন্ধুকে যদি এইভাবে ঘুম পাড়িয়ে রাখা যেত আমি বেঁচে যেতাম।'

ভদ্রমহিলা কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন। আবার বসে পড়লেন। হাতের ঘড়ি দেখলেন। দরজার দিকে তাকালেন। স্বামী এখনো ফিরছে না এটাই বোধ - হয় অস্থিরতার কারণ।

'হিমু সাহেব।'

'জ্বি।'

'ও এসে পড়বে। মিষ্টি পান আনতে গেছে। কাজের ছেলেটা গেছে ছুটিতে, বাধ্য হয়ে ওকেই পাঠাতে হয়েছে। এত দেরি কেন হচ্ছে বুঝতে পারছি না। কোন রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়ছে কিনা কে জানে।'

'আমি কি আশপাশে খুঁজে আসব?'

'দরকার নেই। আপনি কোথায় খুঁজবেন। তারপর বলুন কেমন আছেন?'

'জ্বি ভাল আছি।'

'আরেক কাপ চা খাবেন!'

'জ্বি না।'

'ওর রোগটা কিভাবে হয় সেটা কি আপনি জানেন।'

'জ্বি না।'

'আমার সঙ্গে বিয়ের পরপর সে জার্মানী চলে যায় অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং শিখতে। আমার জন্যে তখন তার খুব মন খারাপ থাকতো। কিছু

ভাল লাগত না। শুধু যখন রেস্টুরেন্টে খেতে যেত তখন আমার কথা ভুলতে পারত। আমাকে ভোলার জন্যে খাওয়া ধরেছে। সেই খাওয়াই কাল হয়েছে।'

'ভালবাসার মনে ক্ষুধার যোগ আছে।'

'প্রেমিক-প্রেমিকাকে সব সময় দেখবেন কিছু না কিছু খাচ্ছে। এই চটপটি, এই আইসক্রীম, এই বাদাম, এই ফুচকা।'

'ও বলছিল আপনি নাকি তার চিকিৎসা করছেন। কি ধরনের চিকিৎসা বলুন তো?'

আমি হকচকিয়ে গেলাম। ব্যাঙাচি আমাকে তার চিকিৎসক হিসেবে উপস্থিত করেছে কেন বুঝতে পারছি না। আমাকে সে এই প্রসঙ্গে কিছু বলেনি।

ভদ্রমহিলা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, কোন চিকিৎসায় ওর কিছু হবে না। চিকিৎসা কম করানো হয়নি। সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানো হয়েছে। ব্যাংকক নিয়ে পেট থেকে এক বালতি চর্বি বের করে ফেলা হয়েছে। অকুপাংচার করানো হয়েছে। একবার একজন বলল যারা সারাক্ষণ খাই খাই করে গাজা খেলে তাদের ক্ষুধা কমে। আমি নিজে গাঁজা কিনে সিগারেটে ভরে তাকে খাইয়েছি। কিছু হয়নি। মানুষটা একদিন খেতে খেতে মারা যাবে। কি কুৎসিত ব্যাপার চিন্তা করে দেখুন তো।

'ঠিক হয়ে যাবে।'

'কোনদিনও ঠিক হবে না। ওর যখন খুব ক্ষিধে পায় তখন ওর চোখের দিকে তাকাবেন। আপনার মনে হবে ও আপনাকে রান্না করে খেয়ে ফেলার কথা মনে মনে ভাবছে। আপনি কি দু'টা মিনিট বসবেন, আমি একটা জরুরী টেলিফোন করে আসি।'

'আমি বসছি। আপনি টেলিফোন করে আসুন। কাজকর্ম সারুন। আমাকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।'

আমি প্রায় এক ঘন্টার মত বসে রইলাম। ভদ্রমহিলা এক সময় বললেন, ভাই, কিছু মনে করবেন না, আপনি কি একটু খুঁজে দেখবেন? আশপাশের রেস্টুরেন্টগুলিতে গেলেই হবে। ও কোন একটা রেস্টুরেন্টে বসে খাওয়া-দাওয়া করছে।

আশপাশের কোন রেস্টুরেন্টে ব্যাঙাচিকে পাওয়া গেল না। ব্যাঙাচি নেই— আমার পাজেরোও নেই। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে ভেগেছে।

আমি হেঁটে হেঁটে মেসে ফিরলাম। ব্যাঙাচিকে যে পাইনি সেই খবরটাও তার স্ত্রীকে দিয়ে এলাম না। বেচারীর বিষন্ন মুখ দেখতে ইচ্ছা করছে না।



তামান্না গায়ে হাত দিয়ে আমাকে ডাকছে, হিমু ভাইয়া। হিমু ভাইয়া। এত আদর করে অনেক দিন কেউ আমাকে ডাকেনি। এটা যে বাস্তব কিছু না, স্বপ্ন দৃশ্য সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেললাম। গায়ে হাত দিয়ে তামান্না আমাকে ডাকবে না। এত আবেগ দিয়ে ভাইয়াও ডাকবে না। ভাইয়া সরাসরি উচ্চারণ করছে না— দু'টা চন্দ্রবিন্দু যুক্ত করেছে। আবেগ মিশ্রিত চন্দ্রবিন্দু— হিমু ভাঁইয়াঁ। হিমু ভাঁইয়াঁ।

আমি এখন দু'টা জিনিস করতে পারি, ঘুম না ভাঙ্গিয়ে স্বপ্নটাকে লম্বা করতে পারি। কিংবা জেগে উঠতে পারি। ঘুমের মধ্যেই দোটানায় পড়ে গেলাম। তামান্না ডেকে যেতে লাগল, হিমু ভাঁইয়াঁ। হিমু ভাঁইয়াঁ। গায়ে ধাক্কার পরিমাণও বাড়তে লাগল। ঘুম ভাঙ্গল। বেলা অনেক হয়েছে, ঘরে রোদ ঢুকে গেছে। বিছানার কাছে মেসের ম্যানেজার সরফরাজ খাঁ দাঁড়িয়ে। চিকন গলায় তিনিই এতক্ষণ ডাকাডাকি করছিলেন। তিনি ডাকছেন— হিমু ভাই। আমার মস্তিষ্ক ভাই ডাকটা বদলে ভাঁইয়াঁ করে ফেলছে।

আমি বিছানায় উঠে বসলাম। ঘুম ভাঙ্গার পর পর মানুষ কিছু কান্ডকারখানা করে— আড়মোড়া ভাঙ্গে, হাই তোলে, চোখ ডলে এবং আবারো ঘুমের সুখ স্মৃতি কল্পনা করার জন্যে কিছুক্ষণের জন্য হলেও চোখ বন্ধ করে ফেলে। আমি তার কিছুই না করে মেস ম্যানেজারের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললাম, 'আমাদের সোনার বাংলা শ্মশান হতে কত বাকি?'

মেস ম্যানেজার শ্রেণীর মানুষ যাদের প্রধান কাজ দিনে আট ন'ঘন্টা কাঠের চেয়ারে বসে থাকা তারা সাধারণত খুব রাজনীতি সচেতন হন। সোনার দেশ কেন শ্মশান হচ্ছে এই নিয়ে তারা খুব ভাবিত থাকেন। সরফরাজ খাঁ সাহেব তার জ্বলন্ত উদাহরণ। সোনার বাংলার ভবিষ্যৎ নিয়ে তার চেয়ে বেশি চিন্তা শেখ হাসিনা কিংবা বেগম জিয়া কেউ করেন বলে মনে হয় না।

এক দুপুরে ঘামে ভিজে ক্লান্ত হয়ে মেসে ফিরেছি। দেখি চোখ-মুখ শক্ত করে সরফরাজ খাঁ সাহেব কাঠের চেয়ারে বসে আছেন। তাঁকে খুবই বিমর্ষ এবং

চিন্তিত মনে হচ্ছে। তিনি চোখের ইশারায় আমাকে ডাকলেন। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বললেন, 'হিমু সাহেব, সোনার বাংলা যে শ্মশান হয়ে গেল সেটা জানেন?'

আমি বললাম, 'পুরোটাই কি শ্মশান হয়ে গেছে না পার্ট বাই পার্ট হচ্ছে?'

'পুরোটাই শ্মশান হয়ে গেছে।'

আমি বললাম, 'তাহলে তো হিন্দু ভাইদের জন্যে খুব সুবিধা হল। তারা যেখানে সেখানে মড়া পোড়াতে পারবে। মড়া নিয়ে এখন আর শ্মশান খুঁজতে হবে না। যে কোন জায়গায় মড়া চিৎ করে শুইয়ে হা করে মুখে আগুন দিয়ে দিলেই হল।'

সরফরাজ খাঁ আহত চোখে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে শান্তগলায় বললেন, 'ঠিক আছে হিমু সাহেব ঘরে যান। আপনার সঙ্গে কোন আলোচনায় যাওয়াটাই ভুল।'

আমি ভেবেছিলাম সোনার বাংলা শ্মশান হওয়া সংক্রান্ত প্রশ্ন শুনে আজও তিনি আহত চোখে তাকাবেন। তা করলেন না। মনে হয় আমার প্রশ্ন তার মাথায় ঢুকেনি। তিনি আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ভীত গলায় ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, 'পুলিশ এসেছে। আমিও পুলিশ।'

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, 'আমাকে এ্যারেস্ট করতে এসেছে?'

'সে রকমই মনে হচ্ছে। পুলিশের একটা জীপ দাঁড়িয়ে আছে মেসের সামনে। পুলিশরা কেউ জীপ থেকে নামেনি। শুধু ওসি সাহেব নেমেছেন। ভয়ংকর রাগী চেহারা।'

'উনি কোথায়?'

'স্যারকে আমার ঘরে বসেয়েছি। চা দিয়েছি। নিমক পরা আনিয়েছি। এক প্যাকেট বেনসন আনিয়ে দিয়েছি।'

'চা-সিগারেট খাচ্ছে?'

'এখন কথা বাড়াবেন না। পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে নিচে চলুন। আপনাকে নিয়ে খুবই টেনশানে থাকি হিমু সাহেব। সাতটা বাজেনি এর মধ্যে পুলিশ এসে উপস্থিত। করেছেন কি আপনি?'

'মন্ত্রীর এক শালাবাবুকে মুখ ভেংচি দিয়েছিলাম। সেই মামলাটা ডিসমিস হয়ে গেছে জানতাম।'

সরফরাজ খাঁ চিন্তিত গলায় বললেন, এত লোক থাকতে মন্ত্রীর শালাকে মুখ ভেংচি দিলেন কেন? বাংলাদেশে কি ভেংচি দেয়ার লোকের অভাব আছে? তের কোটি মানুষ। পনেরো হাজার লোক বাদ দিয়ে বাকি বারো কোটি পঁচাশি লাখ লোককে ভেংচি দিতে পারেন।

রমনা থানার ওসি সাহেব ম্যানেজারের চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর সামনে বেনসনের প্যাকেট পড়ে আছে। প্যাকেট খোলা হয়নি। চায়ের কাপও চুমুক দেয়া। চায়ে সর পড়ে গেছে। ওসি সাহেব পুরনো অভ্যাস মত জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে ভয়ংকর কিছু ঘটে গেছে। ঘুষ পাওয়া যায় না এমন অঞ্চলে পোস্টিং হয়ে গেছে— নিঝুম দ্বীপ টিপের দিকে। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'স্যার কেমন আছেন?'

ওসি সাহেব আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সরফরাজ খাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

সরফরাজ খাঁ দ্রুত ঘর থেকে বের হতে গিয়ে দরজায় প্রচন্ড ধাক্কা খেলেন। মনে হল দরজা ভেঙ্গে পড়ে যাচ্ছে। ওসি সাহেব মহা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এই ইডিয়ট কে?'

আমি ওসি সাহেবের সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বললাম, 'উনি এই মেসের ম্যানেজার সরফরাজ আলি খাঁ। খুব উচ্চ বংশ এবং খাঁটি দেশপ্রেমিক। দেশ নিয়ে উনি সর্বক্ষণ চিন্তা ভাবনা করছেন। গবেষণা করছেন। সোনার বাংলা কেন শ্মশান হচ্ছে আপনি যদি উনাকে জিজ্ঞেস করেন উনি খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে দেবেন।'

'বাজে প্যাঁচাল পারবেন না। আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছি— বলে চলে যাব।'

'বলুন।'

'আপনাকে একটা রেপ কেসের কথা বলেছিলাম মনে আছে?'

'মনে আছে।'

'মিথ্যা আসামী দেয়ার কথা ছিল . . . .?'

'দিয়েছেন?'

'জ্বি না, আসল আসামী ধরেছি। ফাইনাল রিপোর্ট দিয়েছি।'

'আপনাকে এখনো নিঝুম দ্বীপে বদলি করেনি?'

'এত অল্প শাস্তি এরা আমাকে দেবে না। আমার জন্যে অনেক বড় শাস্তি অপেক্ষা করছে।'

'ভয় পাচ্ছেন?'

'ভয় পাচ্ছি না।'

'আমার কাছে এসেছেন কি জন্যে খবরটা দেয়ার জন্য?'

'না। আমি এসেছি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করার জন্যে। ঠিক করে বলুন তো আপনার কি কোন আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে?'

'না।'

'আপনি নিশ্চিত যে আপনার কোন ক্ষমতা নেই?'

'মোটামুটি নিশ্চিত।'

'আমার ধারণা আছে। ঘটনাটা বলি— আমি মিথ্যা আসামীকে ধরে নিয়ে এসেছিলাম। সারারাত জেগে মামলা সাজিয়েছি। ঘুমুতে গেছি ফজরের আজানের পরে। অনিয়ম করেছি তো, ঘুম আসছে না। ঝিমাচ্ছি। এপাশ-ওপাশ করছি। হঠাৎ তন্দ্রার মত এল। মনে মনে আপনাকে স্বপ্নে দেখলাম। আপনি আমাকে বললেন—ওসি সাহেব আপনাকে আমি এত স্নেহ করি আর এটা আপনি কি করলেন। নিরপরাধ কয়েকটা মানুষকে আপনি এমন এক কুৎসিত মামলায় জড়ালেন। আপনার জন্যে ভয়াবহ বিপদ কিন্তু অপেক্ষা করছে। দশ নম্বর মহা বিপদ সংকেত। এখনো সময় আছে। তখন ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। দেখি ঘামে শরীর ভিজে গেছে।

ওসি সাহেব ঠান্ডা সর পড়া চায়ের কাপে নিজের ভুলে চুমুক দিয়ে মুখ বিকৃত করলেন। আমি বললাম, ওসি সাহেব, আপনার মত জাঁদরেল লোক স্বপ্ন দেখে বিভ্রান্ত হন কি করে? এই স্বপ্নের ব্যাখ্যার জন্যে ফ্রয়েড লাগে না। কুতুবুদ্দিন মিয়া টাইপ মানুষজনও ব্যাখ্যা দিতে পারবে। আমি আপনাকে বলেছিলাম মিথ্যা মামলায় না যেতে। ঐ জিনিসটা আপনার মাথায় থেকে গেছে বলেই স্বপ্ন।

'তা না।'

'তা না মানে?'

ওসি সাহেব আবার ঠাণ্ডা চায়ের কাপে চুমুক দিলেন আবারো মুখ বিকৃত করলেন। রুমাল দিয়ে ঠোঁট মুছতে মুছতে বললেন, স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙ্গার পর আপনি যে ব্যাখ্যাটা দিলেন সেই ব্যাখ্যাটা আমার মাথায়ও এল। আমি স্বপ্নটা মোটেই পাত্তা দিলাম না। হাত-মুখ ধুলাম। খবরের কাগজ হাতে নিয়ে রীনাকে বললাম, রীনা চা দাও। রীনা হল আমার স্ত্রী। আমি বারান্দায় বসে কাগজ পড়ছি রীনা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ঢুকল। টেবিলে চায়ের কাপ নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, এই শোন, আমি শেষ রাতে ভয়ংকর একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি। তুমি চোরাবালিতে আটকা পড়েছ। একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছ। বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করছ কেউ শুনছে না। তখন একটা ছেলে ছুটে এল। তার গায়ে হলুদ

রঙের পাঞ্জাবী। সে পাঞ্জাবী খুলে তোমার দিকে ধরেছে। তুমি পাঞ্জাবী ধরলে সে তোমাকে টেনে তুলবে। কিন্তু তুমি কিছুতেই পাঞ্জাবী ধরতে পারছ না। যতই ধরতে চেষ্টা করছ ততই চোরাবালিতে ডেবে যাচ্ছ।

বুঝলেন হিমু সাহেব, রীনার কথা শুনে আমি সাত হাত পানির নিচে চলে গেলাম। কারণ আপনার কথা আমি আমার স্ত্রীকে কিছু বলিনি। স্বপ্নটা কি এখন আপনার কাছে রহস্যময় মনে হচ্ছে?

'না।'

'যাই হোক, আমার কাছে মনে হয়েছে। আমার স্ত্রী শুধু শুধু কেন স্বপ্নে দেখবে আমি চোরাবালিতে পড়েছি।

'আপনি পুলিশ বিভাগে বিপজ্জনক চাকরি করেন। আপনার স্ত্রী আপনাকে নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করেন কাজেই এ ধরনের স্বপ্ন দেখা খুবই স্বাভাবিক। আপনি আপনার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন যে আপনাকে নিয়ে তিনি প্রায়ই দুঃস্বপ্ন দেখেন।'

'আর হলুদ পাঞ্জাবীর ব্যাপারটা?'

'হলুদ পাঞ্জাবীর ব্যাপারটা ঠিক না। স্বপ্ন সব সময় শাদা-কালো হয়। স্বপ্নের আলো হল রাতের আলো। চাঁদের আলোয় রঙ দেখা যায় না বলে স্বপ্ন শাদা-কালো।'

ওসি সাহেব উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, হিমু সাহেব, এই কাগজটা আপনি রাখেন।'

'কি কাগজ?'

'এখানে আমার বাসার ঠিকানা লেখা আছে। আপনি চারটা ডাল-ভাত আমার এখানে খাবেন। আমি দেখতে চাই রীনা আপনাকে দেখে চিনতে পারে কিনা। স্বপ্নের হলুদ পাঞ্জাবী পরা মানুষ আর আপনি যে একই ব্যক্তি আমার ধারণা রীনা সেটা ধরে ফেলবে।'

'কবে আসতে বলছেন?'

'আজই আসুন। রাতে খান। আমি আপনাকে পাংগাশ মাছ খাওয়াব। পাংগাশ মাছ রীনা খুব ভাল রাঁধতে পারে।'

'পাংগাশ মাছ এর মধ্যে জোগাড় হবে?'

'তা হবে।'

'ওসি সাহেব আমি কি কয়েকজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে আসতে পারি? ভাল খাওয়া একা খেয়ে আরাম পাওয়া যায় না, দলবল নিয়ে খেতে হয়।'

'ক' জন বন্ধু আসবে?'

'এই ধরুন চারজন। আমাকে নিয়ে পাঁচ। পাঁচ হল ম্যাজিক নাম্বার। এই জন্যেই পাঁচজন আসতে চাচ্ছি।'

'আসুন, পাঁচজনই আসুন। পাংগাশ মাছ ছাড়া আর কি মাছ খেতে চান?'

'গলদা চিংড়ি?'

'আর কিছু?'

'বড় কাতল মাছের মাথা জোগাড় করতে পারবেন?'

'আর কিছু না।'

'রাত আটটার দিকে চলে আসবেন।'

ওসি সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। তিনি কেমন যেন ইতস্তত করছেন। কিছু বলতে চান, বলতে পারছেন না এমন ভাব। আমি বললাম, 'স্যার কিছু বলবেন?'

'না, কিছু বলব না। আপনারা আটটার দিকে চলে আসবেন। দেরি করবেন না।'

'জ্বি আচ্ছা। স্যার আপনি সিগারেটের প্যাকেট ফেলে যাচ্ছেন।'

ওসি সাহেব সিগারেটের প্যাকেট পকেটে ঢুকালেন। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে ঘর থেকে বেরুতে গিয়ে তিনিও অবিকল সরফরাজ আলি খাঁর মত কপালে ব্যথা পেলেন। সরফরাজ আলি খাঁ ব্যথা পেয়ে কপালে হাত দিয়ে বসে পড়েছিল, ওসি সাহেব তা করলেন না। তিনি প্রচন্ড শব্দে দরজায় লাথি মারলেন। দরজার উপরের কব্জা সত্যি সত্যি খুলে গেল।

আমার চারজন বন্ধু নিয়ে ওসি সাহেবের বাসায় যাবার কথা। আমি ঠিক করে রেখেছি চারজন বন্ধু না, শুধু ব্যাঙাচিকে নিয়ে যাব। পাঁচজনের জন্যে রান্না করা থাকলে তার হয়ে যাবার কথা। তারপরও যদি শর্ট পরে রীনা ভাবী নিশ্চয়ই দশ বারোটা পরোটা চট চট ভেজে দিয়ে দেবে।

মহিলারা ক্ষুধার্ত মানুষকে খাইয়ে আনন্দ পায় তবে সেই ক্ষুধার্ত মানুষকে হতদরিদ্র হলে চলবে না। ভিখিরী বারান্দায় খেতে বসে এক পর্যায়ে যদি ক্ষীণ গলায় বলে, আম্মাজী ভাত শেষ, আর চাইরটা ভাত দেন তাহলে গৃহিণী বলবেন, আর ভাত নাই। তোমার জন্য লংগরখানা খোলা হয় নাই।

জোবেদ সাহেবের দোকানে গেলাম টেলিফোন করতে। ব্যাঙাচিকে দাওয়াতের কথা বলতে হবে। ফাতেমা খালাকেও জানাতে হবে যে পাথর পাওয়া যায়নি। অনুসন্ধান চলছে। যে কোন তুচ্ছ ব্যাপারে দুঃশ্চিন্তা করে ফাতেমা খালা অসুখ বাঁধিয়ে ফেলেন। পাথর এখনো পাওয়া যায়নি এই চিন্তায় তার ডায়রিয়া হয়ে যাওয়া উচিত।

জোবেদ সাহেবের দোকান যথারীতি খালি। মাছিও উড়ছে না। তিনি আমাকে দেখে বিরস মুখে বললেন, 'হিমু সাহেব আপনার কাছে অনেক পাওনা হয়ে গেল। আমি হাসি মুখে বললাম, টাকা পেয়েছি। কুড়ি হাজার টাকা, এইবার আপনার পাওনা মিটিয়ে দেব। টাকা আনতে ভুলে গেছি।'

'আজকালের মধ্যে পেলে সুবিধা হত।'

'আজই পাবেন। রাতে আমার এক জায়গায় দাওয়াত আছে। যাওয়ার পথে দিয়ে যাব। টেলিফোনটা কি ঠিক আছে?'

জোবেদ সাহেব নিতান্ত অনিচ্ছায় বললেন, 'ঠিক আছে। আমি তার পাওনা মিটিয়ে দেব এই কথা তিনি বিশ্বাস করেননি। কোন পাওনাদার যখন দিনক্ষণ উল্লেখ করে বলে এই দিনে টাকা দিয়ে দেব তখন অবধারিতভাবে জানতে হবে টাকাটা পাওয়া যাচ্ছে না।'

'চা খাবেন হিমু সাহেব?'

'জ্বি।'

'আপনাকে এই নিয়ে মোট কতকাপ চা খাইয়েছি জানেন?'

'জ্বি না।'

'আজকেরটা নিয়ে নয়শ আঠারো কাপ।'

'আপনি আমাকে ক' কাপ চা খাওয়াচ্ছেন তারও হিসাব রাখছেন?'

জোবেদ সাহেব ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, দোকানদার মানুষ, হিসাব করা হচ্ছে আমার অভ্যাস। তাছাড়া ব্যবসাপাতি নাই, কাজ কর্ম নাই। ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকলে ফালতু চায়ের কাপের হিসাব করতাম না।

নয়শ আঠারো নম্বর চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে আমি টেলিফোনে কথা বলছি। ব্যাঙাচিকে পাওয়া যায়নি, কথা বলছেন মহিলা ব্যাঙাচি।

'ভাবী আমাকে কি চিনতে পারছেন? আমি. . . ?'

'হ্যাঁ চিনতে পারছি। আপনি গতরাতে এসেছিলেন। আপনি চলে যাবার তিন–চার মিনিটের মাথায় ও এসেছে। এসে যেই শুনেছে আপনি ওর খোঁজ করতে বের হয়েছেন ওম্নি সে আবার বের হয়েছে। ফিরেছে রাত একটায়।'

'বলেন কি?'

'ভাল মানুষের মত ফেরেনি, মারধর খেয়ে ফিরেছে।'

'সেকি, মারধর কে করেছে?'

'হাইজ্যাকাররা ধরেছিল। টাকা পয়সা না পেয়ে চড় থাপ্পর মেরেছে। চর্বিওয়ালা মানুষ —মারলে আরাম লাগে। ওরা মনের সুখে মেরেছে। তাও ভাল চড় থাপ্পরের উপর দিয়ে গিয়েছে। পেটে ক্ষুর বসিয়ে দিলে পারত। পারত না?

'অবশ্যই পারত। ভাবী, ওকি আশপাশে আছে?'

'হ্যাঁ আছে। ঘুমুচ্ছে। খুব ভয় পেয়েছিলাম। রাতে ঘুম হয়নি। সূর্য উঠার পর ঘুমুতে গেছে। ওকে কি ডাকব?'

'না, ডাকার দরকার নেই। ঘুমুক। ওকে শুধু বলবেন রাত আটটার আগে খালি পেটে যেন আমার মেসে চলে আসে। ওর চিকিৎসা শুরু করেছি—প্রথম ডোজটা আজ পড়বে।'

'কি ধরনের চিকিৎসা করছেন?'

'জগাখিচুড়ি টাইপ। টোটকা তন্ত্রমন্ত্র মিলিয়ে একটা চিকিৎসা।'

'আপনার কি ধারণা কাজ হবে?'

'অবশ্যই কাজ হবে।'

'আমি তাকে অবশ্যই আটটার আগে পাঠায়ে দেব।'

'বিকেলে যেন নাশতা টাসতা কিছু না খায়। দুপুরে খেতে পারে কিন্তু সূর্য ডোবার পর কিছু মুখে দেয়া যাবে না।'

'আমি বলে দেখব। তাতে লাভ হবে কিনা জানি না। আমি চোখের আড়াল হলেই কিছু না কিছু খাবে। সোয়াবিন তেল যে খেতে পারে সে সবকিছুই খেতে পারে। মাঝে মাঝে আমার কি মনে হয় জানেন? মাঝে মাঝে মনে হয় — কেউ যদি আমাকে কেটে কুটে রাঁধত। ঝাল দিয়ে ভালমত কষিয়ে একটা বড় জামবাটিতে ওর সামনে দিয়ে বলত, এটা হল তোমার রান্না করা স্ত্রী। আপনার বন্ধু কিন্তু তারপরও খেয়ে ফেলত।'

আমি হা হা করে হাসলাম। তবে আমার হাসি তেমন জমল না। শব্দটা ঠোঁটে হল। এবং ঠোঁটেই ঝুলে রইল। আমার মনে হচ্ছে মহিলার কথা ভুল না। ব্যাঙাচি ঠিকই জামবাটি শেষ করে নিচু গলায় বলবে, তরকারি কি আরো আছে? রানের গোশত পাওয়া যাবে?

নয়শ উনিশ নম্বর চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ফাতেমা খালার সঙ্গে কথা হল। খালা এম্নিতেই উত্তেজিত থাকেন আজ তার উত্তেজনা সীমাহীন। ভালমত কথাই বলতে পারছেন না, কথা গলায় আটকে যাচ্ছে। একসঙ্গে অনেকগুলি কথা বলতে চাচ্ছেন পারছেন না। মানুষের মস্তিষ্ক এক সঙ্গে অনেকগুলি কথা তৈরি করতে পারে কিন্তু মুখে বলতে পারে না। কথা বলার জন্যে দু'টা মুখ থাকলে ভাল হত বোধহয়। একটা মুখ থাকবে শুধু সত্যি কথা বলার জন্যে। আরেকটা মুখ সত্য-মিথ্যা সবই বলবে। আদালতে সাক্ষী দেবার জন্যে সত্যবাদী মুখ ব্যবহার করতে হবে। অন্যমুখ কখনোই ব্যবহার করা যাবে না।

ফাতেমা খালা হড়বড় করে কথা বলে যাচ্ছেন। আমি রিসিভার কানে লাগিয়ে নয়শ উনিশ নম্বর চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছি। চা ভাল হয়েছে। আজ মনে হয় নয়শ বিশ পূর্ণ করতে হবে।

'তোর জন্যে একটা মারাত্মক খবর আছে রে হিমু। তুই বিশ্বাসও করতে পারবি না কত মারাত্মক। তামান্নাকে শেষ পর্যন্ত বিয়ের কথা বললাম। সে রাজি হয়েছে। আমার আশংকা ছিল বোধহয় রাজি হবে না। তুই ষাঁড়ের গোবর হলেও তোর মধ্যে কিছু মজার ব্যাপার আছে। তামান্না বুদ্ধিমতী মেয়ে তো, সে ব্যাপারটা ধরেছে। তবে তামান্না যে বলতেই রাজি হয়ে যাবে ভাবিনি! আমি তামান্নার মা'র সঙ্গেও কথা বলেছি। তিনি বললেন, তামান্নার আসল মা তো আমি না, আপনি যা বলবেন তাই হবে। আপনি যদি পথ থেকে কোন কুষ্ঠরোগী ধরে নিয়ে এসে বলেন, এর সঙ্গে তামান্নার বিয়ে। আমি তখনও বলব, শুকুর আলহামদুলিল্লাহ।'

আমি খালার কথার স্রোতে বাধা দিয়ে বললাম, 'কুষ্ঠ নিরাময় কেন্দ্র থেকে ইয়াং দেখে একটা কুষ্ঠ রোগী ধরে নিয়ে আসব?'

খালা ধমক দিলেন, 'অনেক ফাজলামী করেছিস আর না। শোন হিমু, তোদের বিয়ের সব শপিং আমি করব। বিয়ের শপিং করতে আমার সব সময় ভাল লাগে। ভাবছি কোলকাতায় চলে যাব। শাড়ি-গয়না কোলকাতা থেকে কেনাই ভাল। তবে দাদারা খুব ঠগবাজ। একবার যদি টের পেয়ে যায় আমি বাংলাদেশের দিদি, তাহলে সর্বনাশ। মোলায়েম করে চামড়া ছিলে ফেলবে। এত মোলায়েম করে চামড়া ছিলবে যে বোঝাই যাবে না চামড়া ছিলছে, বরং মনে হবে গা ম্যাসাজ করে দিচ্ছে।'

'কোলকাতা কবে যাচ্ছ?'

'সামনের সপ্তায় যাব। ইচ্ছা করলে তুই আমার সঙ্গে যেতে পারিস। তবে না যাওয়াই ভাল। বিয়ের শপিংএ হবু স্বামীর থাকতে নেই।'

'ঠিক আছে, তুমিই যাও।'

'বউকে কোথায় রাখবি, কি খাওয়াবি এইসব নিয়ে তুই একেবারেই ভাববি না। প্রথম এক বছর আমার সঙ্গে থাকবে। তিনটা ঘর তোকে আমি আলাদা করে দিয়ে দেব।'

'এসি দেয়া ঘর তো খালা?'

'ছাগলের মত কথা বলিস কেন? আমার কোন ঘর কি আছে এসি ছাড়া?'

'তাও তো ঠিক।'

'তোর সঙ্গে বক বক করতে গিয়ে আসল কথাই ভুলে গেছি। পাথর কিনেছিস?'

'না।'

খালা হতভম্ব হয়ে বললেন, 'না মানে? কি বলছিস তুই?'

আমি করুণ গলায় বললাম, 'মেছকান্দর মিয়া পাথর নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।'

'কী সর্বনাশ।'

'সর্বনাশ মানে মহা সর্বনাশ। আমি হাল ছাড়িনি। ঢাকা শহর চষে বেড়াচ্ছি।'

'গাড়ি লাগবে?'

'না, গাড়ি লাগবে না। পাজেরো জীপে করে ভিক্ষুক খোঁজা যায় না। তাছাড়া তোমার পাজেরো জীপের ড্রাইভার আমাকে পছন্দ করে না।'

'পছন্দ করবে কিভাবে, তুই তাকে এক বাড়ির সামনে দাঁড়া করিয়ে উধাও হয়ে গেলি। বেচারা রাত সাড়ে তিনটা পর্যন্ত তোর জন্যে অপেক্ষা করেছে। এসব উদ্ভট কান্ডকারখানা কেন করিস? এই বেচারাকে রাত তিনটা পর্যন্ত শুধু শুধু বসিয়ে রাখলি।'

'আর রাখব না। গাড়িটা তুমি পাঠিয়ে দিও।'

'একটু আগে না বললি গাড়ি লাগবে না।'

'এখন মনে হচ্ছে লাগবে। খালা গাড়িটা তুমি সারারাতের জন্যে দিও। ভিক্ষুকদের খোঁজ বের করার উত্তম সময় হচ্ছে রাত।'

'পাথরটা হাতছাড়া হয়ে গেছে বুঝতে পারিনি। রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে।'

'পাথর তুমি পাবে। একশ পারসেন্ট গ্যারান্টি।'

'পাথরটার কাছে যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়।'

'অবশ্যই। তবে সামান্য কিন্তু আছে।'

'কিন্তু আবার কি?'

'মাংকিস প' গল্পটা জান না খালা— ঐ যে একটা বাঁদরের থাবা ছিল, ঐ থাবাটার কাছে যা চাওয়া যেত তাই পাওয়া যেত। সমস্যা একটাই— ইচ্ছা পূর্ণ হবার পর পরই ভয়ংকর বিপদ হত।'

'বলিস কি? এত খাল কেটে কুমীর আনা।'

'পাথর প্রজেক্ট বাদ দিয়ে দি?'

'না না। আমার পাথর লাগবে। পাথর ছাড়া চলবে না। বিরাট ভুল করেছি — আসলে ঐ দিনই কিনে ফেলা উচিত ছিল।'

'ইয়াকুব প্রজেক্ট কি বাদ?'

'আচ্ছা আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন? অর্থাৎ আগে কখনো দেখেছেন?'

ভদ্রমহিলা নিচু গলায় বললেন, জ্বি না।

'স্বপ্নেও দেখেননি?'

খালা বিরক্ত গলায় বললেন, 'ইয়াকুব তো পালিয়ে যাচ্ছে না। তুই পাথরটা আগে জোগাড় কর।'

'পাথর তোমার চাই-ই?'

'অবশ্যই চাই।'

'মনে হচ্ছে কিছু খরচাপাতি করতে হবে।'

'খরচাপাতি তো করবই। না করেছি? এখন কত লাগবে বল, ড্রাইভারের সঙ্গে পাঠিয়ে দি।'

'এখন লাগবে না। প্রজেক্ট শেষ হোক। তারপর তোমার নামে বিল করব।'

রাত আটটায় ওসি সাহেবের বাসায় যাবার কথা। আমরা আটটার আগেই উপস্থিত হলাম। ওসি সাহেবরা থানার সঙ্গে লাগোয়া সরকারী বাসায় থাকেন বলে শুনেছি—এই বাড়িটা তা না। কলাবাগানে এ্যাপার্টমেন্ট হাউস। কলিংবেল টিপতেই রোগা একজন মহিলা দরজা খুললেন। তাকে দেখে মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ আগে একটা ভয়ের স্বপ্ন দেখে তার ঘুম ভেঙেছে। ভয় এখনো কাটেনি। আমাদের দু'জনকে দেখে ভয় আরো যেন বাড়ল।

আমি বললাম, ওসি সাহেব কি বাসায় আছেন?

মহিলা শংকিত গলায় বললেন, জ্বি না। আপনার নাম কি হিমু?

'জ্বি।'

'জ্বি না, তবে ও আপনার কথা বলেছে। পাঁচজন আসার কথা না?'

'আমার বন্ধুকে নিয়ে এসেছি। ও একাই চারজন —আর আমি এক পাঁচ।'

আমার রসিকতায় কাজ হল না। ভদ্রমহিলা ভীত গলায় বললেন, ওর আসতে একটু দেরি হবে। কি একটা কাজে আটকা পড়ে গেছে। আপনারা বসুন।

আমরা বসলাম। ভদ্রমহিলা বললেন, চা দিতে বলি?

ব্যাঙাচি চিন্তিত চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে। যে অতিথি ডিনারের নিমন্ত্রণে এসেছে চা দিতে বললে সেই অতিথি একটু ভড়কে যাবেই। আমি বললাম, ওসি সাহেব আমাদের ডিনারের দাওয়াত করেছিলেন।

'জ্বি, আমি জানি। ও কোন বাজার করেনি। খুব জরুরী কি একটা কাজে আটকা পড়েছে। ও রেস্টুরেন্ট থেকে খাবার নিয়ে আসবে। আপনাদের বসতে বলেছে।'

'আমরা বসছি।'

'চা দেব?'

'দিতে পারেন।'

অনেকক্ষন অপেক্ষা করার পর কাজের একটি মেয়ে দু'কাপ চা এবং পিরিচে করে খানিকটা চানাচুর দিয়ে গেল।

ব্যাঙাচি ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'চানাচুর খাওয়া ঠিক হবে না। ক্ষিধে নষ্ট হবে।'

আমি বললাম, 'বেছে বেছে দু'একটা বাদাম খেতে পারিস।'

ব্যাঙাচি চারদিকে তাকাতে তাকাতে বলল, 'বিকেলে কিছু না খাওয়ায় ক্ষিধেটা নাড়িতে চলে গেছে। যাই দেখছি তাই খেয়ে ফেলতে ইচ্ছা করছে।'

'সোফা চেয়ার ছাড়া তো এই ঘরে কিছু নেই। সোফা খাবি?'

ব্যাঙাচি কিছু বলল না। যেভাবে সোফার দিকে তাকাচ্ছে তাতে মনে হয় সোফা খাবার ব্যাপারটা সে বিবেচনায় রেখেছে। একেবারেই যে অগ্রাহ্য করছে তা না।

রাত এগারোটা বেজে গেল। ওসি সাহেবের স্ত্রী বড় বাটিতে করে এক বাটি পায়েস এবং পিরিচ চামচ দিয়ে গেলেন। আগের মতই ভীত গলায় বললেন, 'ও এতো দেরি করছে কেন বুঝতে পারছি না। কখনো এ রকম করে না। দয়া করে আর কিছুক্ষণ বসুন। আপনাদের নিশ্চয়ই ক্ষিধে পেয়েছে, পায়েস খান। ঘরে বানানো। কাওনের চাউলের পায়েস।'

আমি বললাম, 'আমাদের জন্যে ব্যস্ত হবেন না। আমরা অপেক্ষা করব। আপনার মনে হয় শরীর ভাল না। আপনি বিশ্রাম করুন।'

'আমার শরীর আসলেই বেশ খারাপ। গায়ে জ্বর আছে। আপনাদের একা বসিয়ে রাখতে খুব খারাপ লাগছে— কিন্তু উপায় নেই।'

ব্যাঙাচি বলল, 'বাসায় টেলিফোন নেই?'

'টেলিফোন আছে। দু'দিন ধরে ডায়ালটোন নেই। আমার এক ভাইকে থানায় খোঁজ নিতে পাঠিয়েছি। আপনারা দয়া করে পায়েস খান।'

আমি পুরোবাটি পায়েস একাই খেয়ে ফেললাম। ব্যাঙাচি খেল না, সে ক্ষুধা নষ্ট করবে না। সে ফিস্‌ফিস্ করে একবার বলল, 'বারোটা পঁচিশ বাজে হোটেল তো সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।'

আমি বললাম, 'তুই হোটেল বন্ধ নিয়ে দুশ্চিন্তা করিস না। ওসি সাহেব কাচা কাজ করবেন না। তিনি খাবারের অর্ডার আগেই দিয়ে রেখেছেন।'

রাত একটায় রীনা ভাবীর ভাই থানার খবর নিয়ে ফিরল। ওসি সাহেবের স্ট্রোকের মত হয়েছে। তাকে সোহ্‌রাওয়ার্দিতে নেয়া হয়েছে। অবস্থা ভাল না।

ওসি সাহেবের স্ত্রী চিৎকার করে কাঁদছেন। আর ঘরে বসে থাকা যায় না। আমি ব্যাঙাচিকে নিয়ে বের হয়ে এলাম। ব্যাঙাচি ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'পায়েসটা না খাওয়া বিরাট বোকামী হয়েছে।'



আজকাল মনে হয় চাইনীজ রেস্টুরেন্টগুলির ব্যবসা খারাপ যাচ্ছে— খালি পায়ে আমাকে ঢুকতে দিতে আপত্তি করল না। রেস্টুরেন্টের বেয়ারা আমার নগ্নপদযুগলের দিকে তাকাল। খুব বিস্মিত হল বলেও মনে হল না। কিংবা কে জানে তার হয়ত বিস্মিত হবার ক্ষমতা চলে গেছে।

চাইনীজ রেস্টুরেন্টে ঢুকলেই অন্ধকার কোণা খুঁজে বসতে ইচ্ছা করে। চট করে কেউ দেখতে পারবে না। আর দেখলেও চিনবে না। আলো থাকবে কম— কি খাচ্ছি তাও পরিষ্কার বোঝা যাবে না। ভাতের মাড়ের মত ঘন এক বস্তু এনে দিয়ে বলবে স্যুপ। চামচ দিয়ে সেই সুপ মুখে তুলতে তুলতে বলতে হবে এই রেস্টুরেন্টের চেয়ে ঐ রেস্টুরেন্ট সুপটা ভাল বানায়। এই কথা থেকে অন্যরা ধারণা করে নেবে যে এই লোক নভিস কেউ না, চাইনীজ রেস্টুরেন্ট সে চষে বেড়ায়।

আমাদেরকে (আমাদের বলছি কারণ তামান্না আছে) ফাতেমা খালা আমাদের দু'জনকে চাইনীজ খেতে পাঠিয়েছেন। চাইনীজ খাবারের মাধ্যমে বিবাহ পূর্ব প্রেম গজাবে এই বোধহয় তার ধারণা। এক টেবিলের দু'দিকে দু'টা চেয়ার। সব চাইনীজ রেস্টুরেন্টে একটা অংশ থাকে প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্যে।

তারা আসে দুপুর বেলা। অতি সামান্য খাবারের অর্ডার দিয়ে এসি ঘরে বসে থাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। মেয়েটি সারাক্ষণ অভিমান করতে থাকে। ছেলেটির প্রধান কাজ হয় অভিমান ভাঙ্গানো। ছেলেটা হয়ত আয়েশ করে সিগারেট ধরিয়েছে মেয়েটা মুখ অন্ধকার করে বলবে, 'তুমি না বললে সিগারেট ছেড়ে দেবে?'

ছেলেটা বলবে, 'বলেছি নাকি?'

'কি বলেছ তাও ভুলে গেছ? আমার নাম মনে আছে তো। নাকি নামটাও ভুলে গেছ।'

'হুঁ, কি যেন তোমার নাম?'

'তোমাকে আমি এমন চিমটি দেব?'

'ও আচ্ছা, তোমার নাম মনে পড়েছে— তোমার নাম চিমটি রানী।'

'একি! তুমি আমাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে সিগারেট ধরিয়ে ফেলেছ? তোমার শয়তানী বুদ্ধি দেখে আমি অবাক হচ্ছি। ফেল বললাম সিগারেট।'

ছেলেটা তৎক্ষণাৎ এসট্রেতে সিগারেট ফেলে দেবে। মেয়েটা চোখ বড় বড় করে বলবে, 'দেখি সিগারেটের প্যাকেট আমার কাছে দাও। দাও বললাম।'

সিগারেটের প্যাকেট দেয়া হবে। মেয়েটা সেই প্যাকেট তার ব্যাগে রাখতে রাখতে বলবে, 'এখন থেকে তোমার যদি সিগারেট খেতে ইচ্ছা করে আমার কাছে চাইবে। আমি যদি দেই তবেই সিগারেট খাবে। না দিলে না।,

'ও-কে।'

'আচ্ছা যাও, আজ চাইনীজ খাওয়া উপলক্ষে তোমাকে একটা সিগারেট খাবার অনুমতি দেয়া হল। পুরোটা খেতে পারবে না। হাফ খাবে।'

'ও-কে।'

'একটু পর পর ও-কে ও-কে করছ কেন?'

ঘন্টা খানিক এই প্রসঙ্গ নিয়েই কথা চলবে। কথার অভাব কখনো হবে না।

তামান্নাকে নিয়ে প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে বসেছি। আরো কিছু জোড়া দেখা যাচ্ছে যারা সমানে কথা বলে যাচ্ছে। আমি কথা খুঁজে পাচ্ছি না। তামান্না খুবই গম্ভীর হয়ে আছে। তার বোধহয় খুব তাড়াও আছে। সে একটু পর পর ঘড়ি দেখছে। আমি অবস্থা স্বাভাবিক করার জন্য বললাম, 'তামান্না তুমি কি খাবে?'

তামান্না অবাক হয়ে বলল, 'তুমি কি খাবে মানে? আমাকে তুমি করে বলছেন কেন?'

'দু'দিন পর বিয়ে হবে, এখন তুমি বলতে অসুবিধা কি? খালা বলেছেন তুমি রাজি।'

'আমি বিয়েতে রাজি এমন কথা কখনো বলিনি। আমি হ্যাঁ-না কিছুই বলিনি।'

'খালা তোমাকে বিয়ে না দিয়ে ছাড়বে বলে মনে হয় না। তুমি তাকে অখুশীও করতে পারবে না। চাকরি চলে যাবে।'

'চাকরি চলে গেলে চলে যাবে। চাকরির জন্যে আমি যাকে তাকে বিয়ে করব?'

'সেটাও একটা কথা। বিয়ের মত একটা বড় ব্যাপার — সামান্য চাকরির জন্যে তোমায় বিয়ে করা ঠিক হবে না।'

'আশ্চর্য কান্ড এখনো তুমি তুমি করছেন। আপনি কি জানেন আপনি খুবই নির্লজ্জ ধরনের মানুষ।'

'এত রেগে যাচ্ছ কেন? তোমার চেঁচামেচি শুনে সবাই আমাদের দিকে আগাচ্ছে— তারা ভাবছে আমরা বোধহয়, প্রেমিক-প্রেমিকা না। স্বামী-স্ত্রী। এমন চেঁচামেচি স্বামী-স্ত্রীরাই করে।'

'প্লীজ আর কথা বলবেন না। খাবারের অর্ডার দিন। খেয়ে চলে যাই। সুপ অর্ডার দেবেন না। আমি খাই না।'

'টাকা এনেছেন তো?'

তামান্না বিস্মিত হয়ে বলল, 'আপনি কি সত্যি সত্যি টাকা আনেননি?'

'না'

তামান্না গম্ভীর গলায় বলল, 'আমার কাছে টাকা আছে। আপনি খাবারের অর্ডার দিন।'

'তুমিই দাও। তোমার কাছে কত টাকা আছে তা তো জানি না। টাকা বুঝে অর্ডার দিতে হবে। কাপড় হিসেব করে জামা বানাতে হবে। আছে হাফসার্টের মত কাপড়, তুমি বানিয়ে বসলে ফুল হাত সার্ট, ডাবল পকেট তা হবে না।'

তামান্না ভুরু কুঁচকে বলল, 'কেন আপনি অকারণে কথা বলছেন? আপনার নিজের ধারণা আপনি খুব মজা করে কথা বলছেন—আসলে তাও না। পুরানো সব কথা শুনতে খুবই বিরক্তি লাগছে।'

'কথা বলব না?'

'না'

'একেবারেই না? তুমি প্রশ্ন করলে উত্তর দেব না— কি তাও দেব না?'

তামান্না জবাব দিল না। সে বিরক্তির প্রায় শেষপ্রান্তে পৌছে যাচ্ছে। ভয়াবহ ধরনের বিরক্ত মানুষ অদ্ভুত সব আচরণ করে। আমাদের ধারণা রাগে-দুঃখে মানুষ কাঁদে। বিরক্ত হয়েও হাউ মাউ করে কাঁদতে আমি দেখেছি। বিরক্তের শেষ সীমায় নিয়ে গিয়ে আমার দেখতে ইচ্ছা করছে তামান্না কি করে। আমার বাবা মহাপুরুষ বানানোর বিখ্যাত কারিগর তার উপদেশমালায় বলে গেছেন—

দুঃখী মানুষের কাছে থাকিও।
শোকগ্রস্ত মানুষের কাছে থাকিও।
রাগে অন্ধ মানুষের কাছে থাকিও।
আনন্দিত মানুষের কাছে থাকিও।
দুঃখ-শোক, রাগ-আনন্দ তোমার ভিতরে আসিতে পারিবে না।
কিন্তু কদাচ বিরক্ত মানুষের কাছে থাকিও না।
বিরক্ত মানুষ ভয়ংকর।

তামান্না এখন প্রচন্ড বিরক্ত কিন্তু তাকে মোটেই ভয়ংকর মনে হচ্ছে না। বরং সুন্দর লাগছে। চশমা যেমন কাউকে কাউকে মানায় সবাইকে মানায় না, বিরক্তিও তেমন কাউকে কাউকে মানায়। তামান্নাকে খুব মানিয়েছে।

আমি খুবই নরম গলায় বললাম, 'তামান্না আমার জন্যে ছোট্ট একটা কাজ করে দেবে?'

তামান্না কিছু বলল না। শুধু তার চোখ তীক্ষ্ণ করে ফেলল। আমি বললাম, 'তাকিয়ে দেখ জানালার কাছে যে প্রেমিক-প্রেমিকা যুগল বসেছে তাদের কাছ থেকে একটা সিগারেট এনে দেবে। তুমি চাইলেই দিয়ে দেবে।'

'ওদের কাছ থেকে সিগারেট এনে দিতে হবে?'

'আমিই চাইতাম। তবে আমি চাইলে নাও দিতে পারে। তোমার মত সুন্দরী কোন মেয়ে যদি সিগারেট ভিক্ষা চায় সে ভিক্ষা পাবেই।'

তামান্না তার ব্যাগ খুলে একশ টাকার একটা নোট বের করে বেয়ারাকে সিগারেট আনতে পাঠাল। এক প্যাকেট সিগারেট একটা দেয়াশলাই। আমি বললাম, 'থ্যাংকস।'

তামান্না বলল, 'থ্যাংকস ট্যাংকস কিচ্ছু দিতে হবে না। আপনি দয়া করে আর একটা কথাও বলবেন না।'

আমি বললাম, 'আচ্ছা।'

আমরা নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করলাম। খাওয়ার সময় তামান্না একবার জিজ্ঞেস করল, 'এদের রান্না তো ভালই, তাই না?' আমি হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লাম। খাওয়ার শেষে তামান্না জিজ্ঞেস করল, 'আইসক্রীম খাবেন?' আমি আবারো হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লাম।

তামান্না বলল, 'ম্যাডামের পাথরটা কি পাওয়া গেছে?'

আমি না সূচক মাথা নাড়লাম। তামান্না বলল, 'প্রশ্ন করলে জবাব দিন। মাথা নাড়ানাড়ি অসহ্য লাগছে। ম্যাডামের পাথরটা জোগাড় হয়নি কেন?'

মেছকান্দর মিয়াকে পাওয়া যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে পাথর নিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কোহিনুর হীরার আদি মালিককে যেমন এক দেশ থেকে আরেক দেশে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে মেছকান্দরের অবস্থা সে রকম হয়েছে। সে তার কোহিনুর নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

'আপনার ধারণা পাথরটা কোহিনুরের মতই দামি?'

'কোহিনুরের চেয়েও দামী। কোহিনুরের ইচ্ছাপূরণ ক্ষমতা ছিল না। এর আছে।'

'ক' টা ইচ্ছা এই পাথর পূরণ করে? একটা না তিনটা?'

'সে ইচ্ছা পুরণ করতেই থাকে। এর ক্ষমতা এক এবং তিনে সীমাবদ্ধ নয়।'

'ভিক্ষুক মেছকান্দর মিয়ার ক'টি ইচ্ছা এই পাথর পূর্ণ করেছে?'

'মেছকান্দর মিয়া কখনো কিছু চায় না বলে তার ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। ভিক্ষুকরা নিজের জন্যে কিছু চায় না। শুধুই অন্যের জন্যে চায়। ভিক্ষা করার সময় এরা কি বলে দয়া করে মন দিয়ে শুনবেন। এরা বলে, 'আল্লা আপনার ভাল করব বাবা। ধনে জনে বরকত দিব।' এরা কখনো বলে না, 'আল্লা তুমি আমার ভাল কর, আমাকে ধন জন দাও।'

'আপনাকে শুনিয়ে না বললেও আড়ালে যে বলে না, তো কি করে জানেন?'

'আড়ালেও বলে না। এরা ধরেই নিয়েছে এই জাতীয় চাওয়া মূল্যহীন। তাদের মত অভাজনের ইচ্ছা পূর্ণ হবার নয়। কাজেই ইচ্ছা ব্যাপারটাই এদের জীবন থেকে চলে গেছে।'

'আপনি মনে হচ্ছে একজন ভিক্ষুক বিশেষজ্ঞ?'

'হ্যাঁ। প্রায়ই আমাকে যেহেতু ভিক্ষা করতে হয় ওদের সাইকলজি আমি জানি।'

'আপনাকে প্রায়ই ভিক্ষা করতে হয়?'

'হ্যাঁ করতে হয়।'

'রাস্তায় কখনো হাত পেতে ভিক্ষা করেছেন?'

'করেছি। এক শবেবরাতের রাতে ভিক্ষা করে তিনশ একুশ টাকা পেয়েছিলাম। খরচ-টরচ দিয়ে হাতে ক্যাশ ছিল দু'শ দশ টাকা।'

'খরচ-টরচ মানে কি? কিসের খরচ?'

'ভিক্ষার জন্যে জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। কোথায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করা হবে তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। ভাল জায়গায় দখলের জন্যে টাকা খাওয়াতে হয়। জায়গা বুক করার জন্যে টাকা তো লাগেই— ভিক্ষা করে যে টাকা আয় হয় তার উপর কমিশনও দিতে হয়।'

'আপনি কি সব সময় বানিয়ে বানিয়ে কথা বলেন?'

'মাঝে মাঝে বলি। সব সময় বলি না।'

'আমার তো ধারণা আপনি সব সময়ই মিথ্যা কথা বলেন। আপনি একজন প্যাথলজিকেল লায়ার। এবং আমি নিশ্চিত আপনার কোন একটা মানসিক ব্যধি হয়েছে। যে কারণে আপনি সত্যি কথা বলতেই পারেন না।'

'হতে পারে।'

'আপনি কি আমার একটা উপদেশ দয়া করে শুনবেন?'

'অবশ্যই শুনব।'

'আপনি একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে কথা বলুন। আপনার চিকিৎসা দরকার।'

আমি বললাম, 'আচ্ছা।'

'আপনি যে একজন মানসিক রোগী তা কি জানেন?'

'জানি।'

তামান্না উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'জানলেই ভাল। বেশিরভাগ মানসিক রোগীই জানে না যে তারা রোগী। সুস্থ মানুষের মত তারা ঘুরে বেড়ায়। খায়দায় ঘুমায়।'

আমি বললাম, 'তুমি কি আমাকে গোটা পঞ্চাশেক টাকা দিতে পারবে। ফাতেমা খালার পাথর তো পাওয়া গেল না—ভাবছি একটা ফলস পাথর কিনে দেব।'

'ফলস পাথর?'

'হ্যাঁ, দু'নম্বরী পাথর। বর্তমান যুগটাই হচ্ছে দু'নম্বরীর। কাজেই দু'নম্বরী পাথরই ভাল কাজ করবে।'

তামান্না গম্ভীর ভঙ্গিতে একশ টাকার একটা নোট বের করে দিল। আমি রিকশা নিয়ে রওনা হলাম। গাবতলী থেকে এই সাইজের একটা পাথর আনতে হবে। সিলেটের জাফলং থেকে নৌকা এবং বার্জ ভর্তি পাথর আসে গাবতলীতে। সেই সব পাথর ভেঙ্গে খোয়া বনানো হয়। সেই খোয়া বাড়িঘর তৈরিতে ব্যবহার হয়। সুন্দর একটা পাথর গাবতলী থেকে জোগাড় করা কঠিন হবে না। পাথরটা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করতে হবে, শিরীষ মারতে হবে। হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড দিয়ে একটা ওয়াশ দিতে পারলে ভাল হবে। দাগটাগ থাকলে উঠে যাবে।

ওসি সাহেবকে দেখার জন্যে হাসপাতালে যাওয়া দরকার। হাসপাতালে তাঁর দিনকাল নিশ্চয়ই ভাল কাটছে না। ক্ষমতাবান মানুষদের জন্যে হাসপাতাল খুব খারাপ জায়গা। হাসপাতালের অপরিসর বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে ক্ষমতাবান মানুষেরা এক সময় হঠাৎ বুঝতে পারেন— ক্ষমতা ব্যাপারটা আসলে ভুয়া। মানুষকে কখনোই কোন ক্ষমতা দেয়া হয়নি।



'এইটাই সেই পাথর?'

ফাতেমা খালা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছেন? এমন মুগ্ধ দৃষ্টিতে নাদির শাহ্ কোহিনুর পাথরের দিকে তাকিয়েছেন বলে মনে হয় না। তাঁর চোখে পলক পড়ছে না। তেতুলের আচার দেখলে কিশোরীর মুখভর্তি লালা এসে যায়। খালার মুখেও লালা জমছে।

'পাথরটার ওজন কত রে?'

'চল্লিশ হাজার ক্যারেটের মত।'

'কত কেজি বল? ক্যারেটে বলছিস কেন?'

'দামী জিনিস তো খালা— এই জন্যেই ক্যারেটে হিসেব হচ্ছে।'

'পাথর জোগাড় করতে খরচ কত পড়ল?'

'খরচ ভালই পড়েছে তবে তুমি এই মুহূর্তে খরচ নিয়ে চিন্তা করবে না। আগে নিশ্চিত হয়ে নাও যে পাথরটা কাজ করে। যদি দেখা যায় এটা ফালতু রাস্তার পাথর তাহলে শুধু শুধু এর পেছনে এত টাকা খরচ করব কেন?'

'পাথর ফেরত নেবে?'

'অবশ্যই ফেরত নেবে। তুমি আগে ব্যবহার করে দেখ জিনিসটা কেমন?'

'ব্যবহারের নিয়ম কি?'

'নিয়ম জটিল না। গোধূলীলগ্নে পাক-পবিত্র হয়ে পদ্মাসনে বসতে হয়। পাথরটা রাখতে হয় কোলে। বসতে হয় উত্তরমুখী হয়ে। পাথরটার উপর প্রথম ডান হাত রাখতে হয়। ডান হাতের উপর থাকবে বাঁ হাত। আঙ্গুলগুলি থাকবে ৯০ ডিগ্রী এঙ্গেলে। মিনিট দশেক চুপচাপ বসে থেকে যা চাইবার তা চাইতে হয়। ও আসল কথা বলতে ভুলে গেছি। পাথরটা কোলে বসাবার আগে পরিষ্কার পানিতে তিনবার ধুয়ে নিতে হবে। মনের ইচ্ছা বলার পর পাথরটা বড় এক বালতি পানিতে ডুবিয়ে রাখবে। ইচ্ছাপূর্ণ হবার পর পাথরটা পানি থেকে তুলতে হবে। যে পানিতে পাথর ডুবিয়ে রাখা হয়েছিল সেই পানি কিন্তু নষ্ট করা যাবে না বা ফেলে দেয়া যাবে না।'

'এক বালতি পানি কি করব?'

'পানিটা ফুটিয়ে বাষ্প করে বাতাসে মিলিয়ে দিতে হবে।'

'জটিল কিছু না। আমার তো মনে হচ্ছে অত্যন্ত জটিল। তুই কাগজে লিখে দে তো। ভাল কথা— যে বালতিতে পাথরটা রাখব সেই বালতি কিসের হবে? প্লাস্টিকের বালতিতে চলবে?'

'প্লাস্টিকের বালতিতে চলবে, সবচে ভাল হয় রুপার বালতিতে রাখলে। অমৃত যেমন মাটির হাড়িতে রাখা যায় না, স্বর্ণ ভান্ডে রাখতে হয় সে রকম আর কি?,

'রুপার বালতি কিনব?'

'বাদ দাও। পাথর কাজ করে কি করে না— আগেই রুপার বালতি।'

খালা বললেন, রুপার বালতিতে আর কত খরচ পড়বে? তুই ম্যানেজারকে নিয়ে যা তো— রেডিমেড রুপার বালতি পাবি বলে তো মনে হয় না। একটা অর্ডার দিয়ে আয়। থাকুক একটা রুপার বালতি।

ম্যানেজার বুলবুল সাহেবকে খুব বিষণ্ন লাগছে। আজ তিনি চকচকে লাল রঙের টাই পরেছেন। লাল টাইও তাঁর বিষন্নতা দূর করতে পারছে না। বরং আরো খানিকটা বাড়িয়ে দিয়েছে। ম্যানেজার সাহেব বললেন, 'আপনার ভাগ্যটা ভাল।'

আমি হাসলাম। ভাগ্য যে ভাল তা স্বীকার করে নিলাম।

ম্যানেজার সাহেব ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'আপনাকে আমি ঈর্ষা করি।'

আমি বললাম, 'আমি নিজেও নিজেকে ঈর্ষা করি।'

'ইদানীং আমার প্রায়ই ইচ্ছা করে স্যুট-টাই ফেলে দিয়ে আপনার মত বের হয়ে পড়ি। তবে খালি পায়ে না। ঢাকার পথে খালি পায়ে হাঁটা খুবই আন-হাইজিনিক।'

'ঠিক বলেছেন।'

'হিমু সাহেব আপনাকে তো কনগ্রাচুলেশন জানানো হয়নি —কনগ্রাচুলেশন।'

'কি জন্যে পাথর খুঁজে পেয়েছি এই জন্যে?'

'তামান্নার সঙ্গে আপনার বিয়ে হচ্ছে এই জন্যে। অত্যন্ত ভাল মেয়ে। রুপ আর গুণ তেল জলের মত। হাজার ঝাঁকালেও মিশে না। তামান্নার ক্ষেত্রে এই মিশ্রণটা ঘটেছে। আপনি অসম্ভব ভাগ্যবান একজন মানুষ।'

'ধন্যবাদ। তামান্নাকে কি আপনার খুব পছন্দ।'

'উনার মধ্যে পছন্দ না হবার কিছু নেই। এক সঙ্গে কাজ করি তো। কাছ থেকে দেখেছি।'

'বিয়ে এখনো ফাইনাল হয়নি। কথাবার্তা হচ্ছে।'

'আমি যতদূর জানি সব ফাইন্যাল হয়েছে। তারিখ পর্যন্ত হয়েছে। ম্যাডাম আপনাকে সারপ্রাইজ দেয়ার জন্যে কিছু বলছেন না। একদিন বিয়ের কার্ড ছাপিয়ে আপনার হাতে ধরিয়ে দিয়ে আপনাকে সারপ্রাইজ দেবেন। ম্যাডামের মধ্যে এইসব ছেলেমানুষী আছে।'

'কার্ডের টাকাটা জলে যাবে। তামান্না শেষ পর্যন্ত রাজি হবে না।'

'একটা খবর আপনি জানেন না, আমি জানি — তামান্না আপনাকে খুবই পছন্দ করেন। পাগলশ্রেণীর মানুষদের জন্যে মেয়েদের বিশেষ কিছু মমতা থাকে। আপনাকে পাগলশ্রেণীর বলায় আশা করি কিছু মনে করছেন না।'

'জ্বি না, মনে করছি না।'

আমি রুপার বালতির অর্ডার দিলাম। ম্যানেজার সাহেব বললেন, 'চলুন আপনাকে কিছু কাপড়-চোপড় কিনে দেই। আপনাকে প্রেজেন্টেবল করার দায়িত্ব ম্যাডাম আমাকে দিয়েছেন।'

আমি বললাম, 'চলুন।'

'স্যুট কখনো পরেছেন ?'

'জ্বি-না।'

'চলুন একটা স্যুট বানিয়ে দেই।'

'চলুন।'

ম্যানেজার সাহেব কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে হঠাৎ বললেন, 'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি হিমু সাহেব, দয়া করে সত্যি জবাব দেবেন।'

'অবশ্যই সত্যি জবাব দেব ?'

'যে পাথরটা আপনি ম্যাডামকে দিয়েছেন— সত্যি কি তার ইচ্ছা পূরণ ক্ষমতা আছে ?'

'এখনো জানি না। আপনি টেস্ট করে দেখুন না। পাথর তো আপনার হেফাজতেই থাকবে।'

'একটা সিগারেট দিন তো হিমু সাহেব, সিগারেট খেতে ইচ্ছা করছে।'

'সিগারেট সঙ্গে নেই। কিনতে হবে। পাঞ্জাবীর পকেট নেই তো— সিগারেট কোথায় রাখব ভেবে কেনা হয় না।'

'আসুন আজ আপনাকে গোটা তিনেক পকেটওয়ালা পাঞ্জাবীও কিনে দেই। অসুবিধা আছে ?'

'জ্বি না, অসুবিধা নেই।'



সুন্দরী মেয়েদের হাতের লেখা সুন্দর হয়। এটা হল নিপাতনে সিদ্ধ। সুন্দরীরা মনে প্রাণে জানে তারা সুন্দর। তাদের চেষ্টাই থাকে তাদের ঘিরে যা থাকবে সবই সুন্দর হবে।

আমি তামান্নার চিঠি হাতে নিয়ে প্রথমেই হাতের লেখার তারিফ করলাম। সুন্দর হাতের লেখার একটা সমস্যা হচ্ছে— ভুল বানান খুব চোখে পড়ে। তামান্নার চিঠি পড়ছি বানান ভুল এখনো চোখে পড়ছে না — মেজাজ খারাপ হচ্ছে। দীর্ঘ একটা চিঠিতে সে বানান ভুল কেন করবে না। সে কি চলন্তিকা সামনে নিয়ে চিঠি লিখতে বসেছে। চিঠি পড়ে তাও তো মনে হচ্ছে না। ডিকশনারী সামনে নিয়ে লেখা চিঠি ভারিক্কী ধরনের হয়, এই চিঠি ভারিক্কী না। বরং মজার ভঙ্গিতে লেখা।

হিমু সাহেব,

আপনাকে একটা মজার খবর দেয়ার জন্যে চিঠি লিখতে বসেছি। আপনাকে তো টেলিফোনে পাওয়া সম্ভব না। কাজেই অফিস পিওনকে বলে দিয়েছি সে যেন সূর্য উঠার আগে আপনার মেসে উপস্থিত হয়। আমাদের এই পিওন বোকা টাইপের। তাকে যা বলা হয় রোবটের মত তাই সে করে। কাজেই আমার ধারণা ভোর পাঁচটায় ঘুম ভাঙ্গিয়ে সে আপনাকে আমার চিঠি দিয়েছে।

মজার খবরটা এখন দিচ্ছি। ম্যাডামের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে, আপনার পাথরটা কাজ করছে। তিনি পাথরের কাছে প্রথম যে জিনিসটা চেয়েছেন তা হল— রাতের ঘুম। পাথর তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করেছে। গত চার রাত ধরে ম্যাডাম কোন রকম ঘুমের অষুধ ছাড়াই ঘুমুচ্ছেন। রাত এগারোটার দিকে ঘুমুতে যান— ভোর ন'টার আগে ওঠেন না। ম্যাডাম পাথরের ক্ষমতা দেখে বিস্মিত। আমি আপনার মানুষকে বিভ্রান্ত করার ক্ষমতা দেখে বিস্মিত।

ম্যাডাম যে হারে লোকজনের কাছে পাথরের গল্প করছেন তাতে মনে হয় কিছুদিনের মধ্যেই পত্রিকা অফিস থেকে লোকজন এসে পাথরের ছবি তুলে নিয়ে যাবে। টেলিভিশনের কোন ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানেও ম্যাডামকে পাথরসহ দেখা যাবে।

হিমু সাহেব, বলুন তো আপনি এই পাথর দিয়ে কি প্রমাণ করতে চাচ্ছেন? কিছুদিন ধরেই আমার মনে হচ্ছে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়া আপনি কিছু করেন না। সেই উদ্দেশ্যটা আমি আসলে ধরতে পারছি না।

যাই হোক, এখন আমি আমার বিয়ের প্রসঙ্গে আসি। আপনি নিশ্চয়ই এর মধ্যে খবর পেয়ে গেছেন যে বিয়ের তারিখ হয়েছে মার্চের ১৫ তারিখ শুক্রবার। দাওয়াতের কার্ড ছাপা হয়েছে। বিয়ের নানান কর্মকান্ড নিয়ে ম্যাডামের সিমাহীন ব্যস্ততা। আমার হাত–পা কাঁপছে। ম্যাডাম এত আনন্দ নিয়ে ছুটাছুটি করছেন—আমি কি করে তাঁকে বলব যে আমার পক্ষে আপনাকে বিয়ে করা কিছুতেই সম্ভব না।

একমাত্র আপনি আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন। আপনি কি দয়া করে বিয়েটা ভেঙ্গে দেবেন? তাহলে আমি আমার মত চাকরি করে যেতে পারি। সব ঠিকঠাক মত চলতে থাকে। বিয়ে ভাঙ্গার কারণে ম্যাডাম যদি আপনার উপর রাগ করে তাহলে আপনার কিছুই যাবে আসবে না। কিন্তু আমার যাবে আসবে। আমার পক্ষে চাকরি ছেড়ে দেয়া কিছুতেই সম্ভব না। আপনি আমার জন্যে কিছু না করলে আমাকে নিতান্তই বাধ্য হয়ে আপনাকে বিয়ে করতে হবে। তার ফল আপনার বা আমার কারো জন্যেই শুভ হবে না।

আমি আপনার কাছে হাত জোড় করছি, আপনি আমাকে এই মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করুন।

বিনীতা
তামান্না।

চিঠি শেষ করে খুশি খুশি লাগছে। এক ভুল বানান পাওয়া গেছে সীমাহীনের সী লিখেছে হ্রস্যইকার দিয়ে। অবশ্যি দীর্ঘই নাও হতে পারে। আধুনিককালের বানান তো সব পাল্টে যাচ্ছে। শাড়ী বাড়ী এখন লেখা হচ্ছে হ্রস্যইকার দিয়ে। সূর্য লেখার সময় আগে রেফের পরে য–ফলা লাগত। এখন লাগে না—সূর্যের তেজ কমে গেছে। তার জন্যে বাড়তি য–ফলা এখন দরকার নেই।



ফাতেমা খালার বসার ঘরের এক কোণায় খালার ম্যানেজার বসে আছেন। ম্যানেজার মুখ গম্ভীর। চোখ বিষণ্ন। বসার ভঙ্গিও বিষণ্ন। হালকা সবুজ স্যুট এবং চকচকে লাল টাই এ বিষণ্নতা দূর করছে না। ফাইজার অষুধ কোম্পানি এখন তাকে দিয়ে বিজ্ঞাপন করতে পারে। তাঁর একটা ছবি। ছবির নিচে ক্যাপশান—

বিষণ্নতা একটি ব্যাধি।

ম্যানেজার আমার দিকে তাকালেন–অপরিচিত মানুষের দিকে যে দৃষ্টিতে তাকানো হয় অবিকল সেই দৃষ্টি। আমি হাসিমুখে বললাম, 'ম্যানেজার সাহেব, আপনার কি বিষণ্নতা ব্যাধি হয়েছে?' ম্যানেজার চট করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তামান্না ম্যাডামের সঙ্গে আছে।'

ভদ্রলোক আমি কি বলেছি না শুনেই জবাব দিয়েছেন। লক্ষণ মোটেই ভাল মনে হচ্ছে না। আমি বললাম, 'আপনি ভাল আছেন?'

'জ্বি।'

'কোন কারণে কি মন খারাপ?'

'জ্বি না, মন ভাল। তামান্না ম্যাডামের সঙ্গে আছেন।'

'তামান্নার কথা কিছু জানতে চাইনি। আপনার কি হয়েছে বলুন তো?'

'শরীর ভাল যাচ্ছে না। ঘুমের সামান্য সমস্যা হচ্ছে।'

'ইচ্ছাপূরণ পাথরে হাত দিয়ে ঘুম চাইলেই হয়। ঘুমের অষুধ তো আপনার হাতের কাছে। হাত বাড়ালেই পাথর।'

ম্যানেজার সাহেব বসে পড়েছেন। এখন তার দৃষ্টি ঘরের কার্পেটে। কার্পেটের নকশার সৌন্দর্যে তার বিষণ্নতা আরো বাড়ছে। আমি খালার সন্ধানে ভেতরে ঢুকে গেলাম। এ বাড়িতে এখন আমার অবাধ গতি— যে কোন ঘরে ঢুকে যেতে পারি। কাজের মেয়েগুলি চাপা রাগ নিয়ে তাকায় কিন্তু কিছু বলে না।

খালাকে তার শোবার ঘরে পাওয়া গেল। তিনি পা ছড়িয়ে বিছানায় বসে আছেন। একটা কাজের মেয়ে তার চুলের গোড়ায় তেল ডলে ডলে দিচ্ছে। প্রক্রিয়া যথেষ্টই জটিল। এক গোছা চুল আলাদা করে তুলে ধরা হয়। চুলের গোড়া ম্যাসাজ করা হয়। তেল দেয়া হয়। সেই চুলের গোছা ধরে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণে কিছুক্ষণ টানাটানি করা হয়।

খালা ইশারায় খাটের উপর আমাকে বসতে বললেন। এবং ইশারাতেই কাজের মেয়েটিকে চলে যেতে বললেন। অতিরিক্ত ধনবানেরা ইশারা বিশারদ হয়ে যায়। এমনিতে সারাক্ষণ কথা কিন্তু আদেশ জারির ক্ষেত্রে চোখের বা হাতের ইশারা।

'মাথার চুল সব পড়ে যাচ্ছে রে হিমু! খুব দুশ্চিন্তায় আছি।'

'দুশ্চিন্তার কি আছে? পাথরের কাছে চুল চাও।'

'সামান্য জিনিস চাইতে ইচ্ছা করে না। বড় কিছু হোক তখন চাইব। পাথর তো ঘরেই আছে। পালিয়ে যাচ্ছে না তো।'

'পাথর তোমার মনে ধরেছে?'

খালা সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বর নামিয়ে বললেন, 'পাথর নিয়ে শুরুতে তোর একটা কথাও আমি বিশ্বাস করিনি। ব্যবহার করে আমি হতভম্ব।'

'কোন সাইড এফেক্ট নেই তো?'

'সাইড এফেক্ট আছে তবে পজেটিভ সাইড এফেক্ট। আমার তো রাতে ঘুম হত না। পাথরটার কাছে ঘুম চাইলাম। এখন কোন অষুধ ছাড়া মড়ার মত ঘুমুচ্ছি। রাত দশটার সময় বিছানায় যাই। পুরানো অভ্যাসমত ভেড়া গুনতে শুরু করি। বললে বিশ্বাস করবি না চল্লিশটা ভেড়া গোনার আগেই ঘুম।'

'সাইড এফেক্ট কি?'

'বললাম না পজেটিভ সাইড এফেক্ট। যেসব জিনিস নিয়ে দুশ্চিন্তা হত সে সব নিয়ে এখন আর দুশ্চিন্তা হয় না। ঐ যে ইয়াকুবকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা করতাম— তোর খালু কেন ঐ হারামজাদাটাকে এত টাকা দিয়ে গেল। এখন আর দুশ্চিন্তা হয় না। দিয়েছে ভাল করেছে।'

'ইয়াকুবের সঙ্গে কথা বলব না?'

'কোন দরকার নেই।'

'তোমার জীবন তো খালা টেনশান ফ্রি হয়ে যাচ্ছে, তুমি বাঁচবে কি করে? এখন তো তুমি হুট করে মরে যাবে।'

'খামাখা কথা বলিসনা তো হিমু।'

'বেঁচে থাকার জন্যে টেনশান লাগে খালা। যার যত টেনশান তাঁর বাঁচা তত আনন্দময়।'

'আমার টেনশান যথেষ্টই আছে। আমার টেনশান নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। বুলবুল বলছে চাকরি করবে না। আমি চোখে অন্ধকার দেখছি। বুলবুলের মত আরেকজন মাসে লাখ টাকা দিলেও পাব না।'

'বুলবুল সাহেব চাকরি করবেন না কেন?'

'জানি না কেন, পরিষ্কার করে কিছুই বলছে না। সারাক্ষণ মুখ ভোঁতা করে থাকে।'

'পাথরকে বল বুলবুল যেন তোমাকে ছেড়ে না যায়।'

'তাই মনে হয় বলতে হবে। হিমু তুই পাথরটার খরচ নিয়ে যা। কত খরচ পড়ল?'

'পাথর উদ্ধারের ব্যাপারে একজনের সাহায্য নিয়েছি। বলতে গেলে সেই পাথর এনে দিয়েছে। তার নাম ছক্কু। ছক্কুর খুব শখ একটা স্টেশনারীর দোকান দেবে।'

'এ তো মেলা টাকার ব্যাপার।'

'পাথরটা কি তুমি দেখবে না?'

'আচ্ছা যা দোকান দিয়ে দেব। বুলবুলকে এখনি বলে দিচ্ছি সে সব ব্যবস্থা করে রাখবে।'

'আমি ছক্কুকে নিয়ে আসি?'

'যা নিয়ে আয়। আর দাওয়াতের কার্ডগুলি নিয়ে যা। তুই তোর বন্ধুবান্ধবকে দাওয়াত করবি না?'

'কার্ড সুন্দর হয়েছে খালা।'

'সুন্দর হবে না? কি বলিস তুই? কার্ড আমি নিজে বেছে কিনেছি।'

'তামান্না কি আশপাশে আছে?'

'হ্যাঁ আছে। এখন ওর সঙ্গে আড্ডা দিতে যাবি না। বিয়ের আগে কনের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হওয়া ঠিক না।'

'আমি শুধু একটা কথা বলে চলে যাব।'

'কি বলবি?'

'সেটা তো খালা তোমাকে বলা যাবে না।'

কৌতূহলে খালার চোখ চকচক করছে। কি কথাটা বলা হবে তা জানার জন্যে তার মধ্যে টেনশান তৈরি হচ্ছে। টেনশান তৈরি হচ্ছে বলেই তিনি বেঁচে আনন্দ পাচ্ছেন।

খালার হাত থেকে দাওয়াতের কার্ড নিলাম। প্রথম কার্ডটা দিলাম তামান্নাকে। আমার বিয়ের নিমন্ত্রণ আমি আমার হবু স্ত্রীকে করব না? সেটাই তো স্বাভাবিক।

তামান্না গম্ভীর গলায় বলল, 'থ্যাংকস।'

আমি বললাম, 'তুমি কেমন আছ তামান্না?'

তামান্না বলল, 'ভাল।'

'তোমার ঘুম হচ্ছে তো?'

তামান্না কিছু বলল না। তার চোখে রাগ নেই, দুঃখবোধ নেই, অভিমান নেই। যেন সে পাথরের একটা মেয়ে। আমি দাওয়াতের কার্ড নিয়ে রওনা হলাম। কার্ডগুলি বিলি করতে হবে। কার্ড কাদের দেব ভাবতে ভাবতে যাচ্ছি—

ভিক্ষুক মেছকান্দার
ছক্কু
দেশ প্রেমিক জোবেদ আলি
ওসি রমনা থানা
ইয়াকুব সাহেব।

আচ্ছা রূপাকে একটা কার্ড দেব না? অবশ্যই দেব। সবার শেষে দেব। রূপাকে কার্ড দেবার পর যে কার্ডগুলি বাঁচবে সেগুলি কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলতে হবে।

'আমাকে চিনতে পারছেন?'

'হিমু সাহেব না?'

'ঠিকই চিনেছেন। আমি আপনাকে চিনতে পারছিলাম না। আপনার একি অবস্থা?'

'মরতে বসেছি হিমু সাহেব।'

'তাই তো দেখছি।'

ওসি রমনা থানা উঠে বসতে গিয়েও বসলেন না। আবার শুয়ে পড়লেন। বড় বড় করে শ্বাস নিতে লাগলেন। এই কয়েকদিনেই তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে। চোখে মুখে ঘুম ঘুম ভাব। ডাক্তাররা সম্ভবত ঘুমের অষুধের মধ্যেই তাঁকে রাখছে। চোখ কোটরে ঢুকে গেছে।

ভদ্রলোক কেবিনে সীট পাননি। তার দু'পাশেই রোগীর সমুদ্র। এদের মধ্যে একজন বোধহয় মারা যাচ্ছে। ডাক্তার নার্স তাকে নিয়ে ছোটাছুটি করছে। আমি ওসি সাহেবের পাশে বসতে বসতে বললাম, 'আপনার হয়েছেটা কি বলুন দেখি।'

'স্ট্রোক করেছে। বাঁ পাটা কোমরের নিচ থেকে অচল।'

'বলেন কি?'

'পুরো ভেজিটেবল হয়ে গেছি। নিজেকে মনে হচ্ছে চালকুমড়া।'

ওসি সাহেব আবারো উঠে বসতে গেলেন। আমি তাকে সাহায্য করলাম। পিঠের নিচে বালিশ দিয়ে দিলাম। ওসি সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, 'একটা মশা আমাকে খুব বিরক্ত করছে। মেরে দিন তো।'

আমি মশা মেরে দিলাম। ওসি সাহেব মৃত মশার দিকে খুব আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকলেন। কোন মৃত মশার দিকে এত কৌতূহল নিয়ে রোমান্স রসও তাকাননি। ওসি সাহেব মশার দিকে তাকিয়ে থেকেই বললেন, 'হিমু সাহেব। যেন আমি না, মশাটাই হিমু।'

আমি বললাম, 'জ্বি।'

'আপনি এসেছেন আমি খুব খুশি হয়েছি। আপনি কি একটা ব্যাপার জানেন? আমি যে মরতে বসেছি আপনার জন্যেই মরতে বসেছি।'

আমি বললাম, 'জানি। আমার কথা শোনার জন্যে আপনার উপর প্রেসার তৈরি হল। সেই প্রেসারে স্ট্রোক। আপনার চাকরি আছে না, গেছে?'

'সাসপেনসনে আছি। চাকরি শেষ পর্যন্ত থাকবে বলে মনে হয় না।'

'অপরাধী যাদের ধরেছিলেন তারা কি ছাড়া পেয়েছে?'

'জ্বি না। তারা ছাড়া পায় নাই। তদন্তের ফলাফল এমন যে ছাড়া পাওয়া মুশকিল। তাছাড়া অস্ত্রসহ ধরা পড়েছে।'

অনেকক্ষণ পর ওসি সাহেবের মুখে আনন্দের হাসি দেখা গেল।

'হিমু সাহেব!'

'জ্বি।'

'আমি তো মরতে বসেছি কিন্তু আছি সুখে। অনেকদিন পর প্রথম বুঝলাম যে আমি মানুষ। এত ভাল লাগল। চাকরি চলে গেলে চলে যাবে— ভিক্ষা করব।'

'পা নষ্ট ভিক্ষা করার জন্যে ঘোড়া কিনতে হবে। ঘোড়ায় চড়ে ভিক্ষা।'

ওসি সাহেব শব্দ করে হেসেই হাসি গিলে ফেললেন। হার্টের রোগীদের জেনারেল ওয়ার্ড শব্দ করে হাসির জায়গা না। অন্য রোগীরা অবাক হয়ে আমাদের দেখছে।

'হিমু সাহেব!'

'জ্বি।'

'খুব ছোটবেলায় মা মারা গিয়েছিল। মায়ের চেহারা-টেহারা কিছুই মনে নেই। গতকাল রাতেই মাকে স্বপ্নে দেখলাম। মা বললেন, খোকন, তোর উপর আমি খুশি হয়েছি। তোর পা ঠিক হয়ে যাবে, পা নিয়ে দুশ্চিন্তা করিস না।'

'নানান ধরনের অপরাধ আপনি করতেন। অপরাধবোধ থেকে মুক্ত হওয়ায় এই স্বপ্ন দেখছেন।'

'আপনার যা ইচ্ছা আপনি বলতে পারেন। ঘটনা যে কি তা আমি জানি।'

'ভাবী কোথায়?'

'ও বেবী এক্সপেক্ট করছে তো। এডভান্সড স্টেজ। প্রতিদিন আসতে পারে না। গতকাল এসেছিল আজ আসবে না।'

'ভাবী বেবী এক্সপেক্ট করছেন না-কি? উনাকে দেখে কিছু বোঝা যায়নি।'

'খুব সবধানে নিজেকে আড়াল করে রাখে বলে কিছু বোঝা যায় না।'

'এটাই কি উনার প্রথম সন্তান?'

'এর আগে তিনটা সন্তান হয়েছে। তিনটা সন্তানই মৃত অবস্থায় হয়েছে। তবে এবারেরটা বাঁচবে। কি হিমু সাহেব, আপনি বলেন দেখি বাঁচবে না?'

'হ্যাঁ বাঁচবে।'

'আমি ঠিক করে রেখেছি ছেলে হলে নাম রাখব হিমু।'

'আপনার মেয়ে হবে।'

'মেয়ে হলে তার নাম হিমি।'

ওসি সাহেব আবারো শব্দ করে হাসলেন। এবার আর হাসি গিলে ফেললেন না। অন্যান্য বেডের রোগীরা উৎসুক চোখে তাকাচ্ছে। কেউ রাগ করছে না।

আমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, 'ওসি সাহেব কার্ডটা রাখুন।'

ওসি সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কিসের কার্ড?'

'বিয়ে করছি। বিয়ের কার্ড। আপনি অসুস্থ মানুষ যেতে পারবেন বলে মনে হয় না।'

'আপনি বিয়ে করবেন আর আমি যাব না, তা কি করে হয়। আমি এম্বুলেন্সে করে হলেও আপনার বিয়েতে যাব।'

সারাদিন আমি বিয়ের কার্ড দিয়ে বেড়ালাম। কেউ বাদ পড়ল না। ভিক্ষুক মেছকান্দর মিয়াও একটা কার্ড পেল। আমি বললাম, 'ভিক্ষুক সাহেব মনে করে যাবেন কিন্তু। কাপড় চোপড় যা আছে তাতেই চলবে শুধু পাথরটা সঙ্গে নেবেন না। ডুপ্লিকেট হয়ে গেলে অসুবিধা আছে।'

মেছকান্দর বিড় বিড় করে বলল, কি কন কিছুই বুঝি না।

'আমি বিয়ে করছি বিয়ের দাওয়াত।'

'সাব আপনে বড় ত্যক্ত করেন।'

'আচ্ছা যাও আর তাক্ত করব না। ভাল কথা তোমার পাথর কিন্তু এখনো কিনতে পারি। লাস্ট প্রাইস কুড়ি হাজার টাকা।'

'পাথর বেচুম না।'

বিয়ের দাওয়াত সবাইকে দিলাম শুধু ইয়াকুব সাহেবকে পাওয়া গেল না। তাঁর খোঁজে গিয়ে শুনলাম পাঁচ মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি রেখে তিনি রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গেছেন। বাড়িওয়ালা বের হয়ে আমার সঙ্গে খুব হম্বিতম্বি করতে লাগল, আপনি যদি তার রিলেটিভ হন তাহলে খবর আছে। আপনার গলায় গামছা দিয়ে আমি টাকা আদায় করব।

আমি বিনীতভাবে বললাম, আমিও আপনার মতই পাওনাদার। আজ আমাকে টাকা দেবার কথা।

'আপনার কত টাকা গেছে?'

'প্রায় দশ হাজার।

'কি রকম হারামজাদা লোক আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। মধুর ব্যবহার। যেদিন চলে যাবে সেদিনও আমাকে বাসায় ডেকে এনে চা খাইয়েছে। বাসার প্রতিটা জিনিস এর মধ্যে সরিয়ে ফেলেছে। কিচ্ছু বুঝতে পারি নাই। একটা ডাবল খাট ছিল সেই খাটও নাই।'

'বলেন কি?'

'এত বড় খাট কি করে সরাল সেটাই আমার মাথায় আসে না।'

'এডভান্স না রেখে বাড়ি ভাড়া দেয়া ঠিক হয় নাই।'

'অতি সত্য কথা বলেছেন। কথা দিয়ে ভুলিয়ে ফেলেছে। আমার স্ত্রী এখন আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে।'

'হাসাহাসি করারই কথা।'

বাড়িওয়ালা আমাকে ছাড়লেন না। চা বিসকিট খাওয়ালেন। দেশ যে মানুষের বদলে অমানুষে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে এই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে ঐকমত্যে পৌঁছে ছাড়া পেলাম। বাকি রইল শুধু রূপা। রূপার কাছে যেতে ভয় ভয় করছে। সে কি বলবে কে জানে।

রূপা কার্ড হাতে নিয়ে হাসল। হাসতে হাসতে বলল, 'কার্ডটা খুব সুন্দর। তুমি কিনেছ?'

'না। আমার খালা কিনেছেন।'

'ধবধবে সাদা কার্ডে রূপালী লেখা। জোছনা জোছনা ভাব। তোমার বিয়েও তো দেখি পূর্ণিমা রাতে।'

'ঐ দিন পূর্ণিমা?'

'আজকাল জোছনার হিসাব রাখ না?'

ন।'

'আমি রাখি। তোমার বিয়ে পূর্ণিমার রাতেই হচ্ছে।'

'একসেলেন্ট। রূপা তুমি বিয়েতে যাচ্ছ তো?'

রূপা আবারো হাসল। এমনিতে সে খুব কম হাসে। ছোটবেলায় কেউ বোধ-হয় তাকে বলেছিল— তাকে বিষণ্ণ অবস্থায় দেখতে ভাল লাগে। ব্যাপারটা তার মাথায় ঢুকে গেছে। সে সারাক্ষণ বিষণ্ণ থাকে। আজ হাসছে। এর মধ্যে তিনবার হাসল।

'হাসছ কেন রূপা?'

'তুমি বদলে যাচ্ছ— এই জন্যে হাসছি। মানুষকে তুমি আগে ধোঁকা দিতে না। এখন দিচ্ছ।'

'কাকে ধোঁকা দিচ্ছি?'

'তামান্না নামের মেয়েটাকে দিচ্ছ। বিয়ের রাতে সবাই উপস্থিত হবে। তুমি হবে না। তুমি জোছনা দেখতে জঙ্গলে চলে যাবে। মেয়েটার কি হবে ভেবেছ কখনো?'

'এমন যদি আমি করি তামান্নার কিছুই হবে না। তামান্নার জন্যে একজন স্ট্যান্ডবাই বর আছে। ফাতেমা খালার ম্যানেজার বুলবুল সাহেব। তার সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাবে। বাকি জীবন দু'জনে সুখেই কাটাবে।'

'ওরা দু'জন বিয়ে করবে ভাল কথা— মাঝখানে তুমি জড়ালে কেন?'

'আমি না জড়ালে বিয়েটা হত না।'

'তোমার সমস্যা কি জান হিমু? তোমার সমস্যা হল নিজেকে তুমি খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে কর।'

'সেটা কি দোষের? সামান্য যে বালিকণা সেও নিজেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করে।'

'বালির কণা এই কথা তোমাকে বলে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

রূপা আবারো হাসল। এই নিয়ে সে হাসল চারবার। পঞ্চমবার হাসলেই ম্যাজিক নাম্বার পূর্ণ হবে। তখন আমাকে উঠে পড়তে হবে।

'রূপা!'

'বল শুনছি।'

'অনেকদিন জোছনা দেখা হয় না। গাজীপুরের জঙ্গলে আমার সঙ্গে জোছনা দেখবে?'

রূপা পঞ্চমবারের মত হেসে উঠে বলল, 'না।'



ব্যাঙাচি বলল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

আমি বললাম, 'গাজীপুরের শালবনে। জোছনা দেখব। জঙ্গলের জোছনা তুলনাহীন। একবার ঠিকমত দেখলে জোছনা মাথার ভেতর ঢুকে যায়। জীবনটা অন্য রকম হয়ে যায়।'

'আজ না তোর বিয়ে? আমি গিফট কিনে রেখেছি। তোর ভাবী পার্লার থেকে চুল বাঁধিয়ে এনেছে।'

'বিয়ে ভেঙ্গে গেছে।'

'সেকি?'

ব্যাঙাচি অসম্ভব মন খারাপ করল। সে মমতামাখা গলায় বলল, 'তোর ভাগ্যটা এত খারাপ কেন দোস্ত!'

'জানি না।'

'এই দেখ তোর জন্যে আমার চোখে পানি এসে গেছে।'

'আমার সঙ্গে জোছনা দেখতে জঙ্গলে যাবি?'

'অবশ্যই যাব। তুই যেখানে যেতে বলবি সেখানে যাব। তুই যদি নর্দমায় গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে থাকতে বলিস তাই করব।'

'বিয়ে বাড়ির চমৎকার খাওয়া মিস করবি মন খারাপ লাগছে না?'

'না দোস্ত লাগছে না। মন খারাপ লাগছে তোর জন্যে। তোর ভাগ্য দেখি আমার চেয়েও খারাপ।'

জোছনা দেখতে রওনা হবার আগে তামান্নার সঙ্গে কথা বললাম। কমিউনিটি সেন্টারে টেলিফোনে খুব সহজেই তাকে ধরা গেল। সে টেলিফোন তুলে প্রথম যে কথাটা বলল, তা হচ্ছে— 'আপনি আসছেন না, তাই না?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। তুমি যা চেয়েছিলে তাই হচ্ছে।'

তামান্না বলল, 'শুনুন, আমি মত বদলেছি। আপনি আসুন। আপনাকে আগে অনেক কঠিন কঠিন কথা বলেছি তার জন্যে আমি লজ্জিত। প্লীজ আপনি আসুন।'

'ম্যানেজার বুলবুল সাহেব আছেন। তিনি তোমাকে খুবই পছন্দ করেন। তোমার বিয়ে হবে ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে।'

'আপনাকে কে বলল?'

'আমাকে কেউ বলেনি। তবে ম্যানেজার সাহেব ইচ্ছা পূরণ পাথরে হাত রেখে এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। পাথর তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করেছে।'

'প্লীজ আপনি আমাকে রূপকথা শুনাবেন না; পৃথিবীটা রূপকথা নয়।'

'কে বলল পৃথিবী রূপকথা নয়?'

'আপনি আসবেন না?'

'না। আজ আমার জোছনা দেখার নিমন্ত্রণ।'

'হিমু সাহেব শুনুন...।'

আমি টেলিফোন রেখে দিলাম।

গাজীপুরের জঙ্গলে ঢোকার মুখে দেখি একটা প্রাইভেট কার দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি নষ্ট। স্টার্ট নিচ্ছে না। এক ভদ্রলোক তার স্ত্রী এবং দু'টা বড় বড় মেয়ে নিয়ে খুব বিপদে পড়েছেন। হাত উঁচিয়ে হাইওয়ের গাড়ি থামাতে চাইছেন। কোন গাড়ি থামছে না। বাংলাদেশের হাইওয়ের নিয়ম-কানুন পাল্টে গেছে। হাইওয়েতে গাড়ি চালাবার প্রথম নিয়ম হচ্ছে কোন বিপদগ্রস্ত পথে দেখলে গাড়ি থামাবে না। গাড়ি থামালেই বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করতে হবে। তোমার দেরি হয়ে যাবে। তুমি নিজেও বিপদে পড়তে পার। কি দরকার।

আমি ব্যাঙাচিকে নিয়ে এগিয়ে গেলাম। ব্যাঙাচির বিশাল শরীর দেখে মেয়ে দু'টি ভয়ে অস্থির হয়ে গেল। আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আপনাদের সমস্যা কি? গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না?'

ভদ্রলোক বললেন, 'না।'

আমি বললাম, 'আমার এই বন্ধু অটোমোবাইল ইনজিনিয়ার। গাড়ির বনেট খুলুন ও দেখুক।'

ভদ্রলোক অনিচ্ছার সঙ্গে গাড়ির বনেট খুললেন। ব্যাঙাচি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ি স্টার্ট করে দিল।

ভদ্রলোকের চোখে-মুখে কৃতজ্ঞতা। মেয়ে দু'টি আনন্দে চেঁচাচ্ছে। ভদ্রলোকের স্ত্রী বললেন, ভাই, আমরা দু'ঘন্টা ধরে জঙ্গলে পড়ে আছি। কি করে যে আপনাদের ঋণ শোধ করব।

আমি ভদ্রলোকের কাছে এগিয়ে গেলাম। গম্ভীর গলায় বললাম, 'স্যার আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন?'

ভদ্রলোক বিস্মিত গলায় বললেন, 'জ্বি না।'

'আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি। আপনি খুব উঁচু পদের একজন মিলিটারী অফিসার না?'

'আমি সেনাবাহিনীর একজন ব্রিগেডিয়ার। স্ত্রী কন্যাদের নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি।'

'অনেককাল আগে আপনি আমাকে একটা লিফট দিয়েছিলেন। এক প্যাকেট সিগারেট দিয়েছিলেন। মনে পড়ছে?'

'ও আচ্ছা হ্যাঁ, মনে পড়েছে।'

'আমি সেই ব্যক্তি। আমার খুব ইচ্ছা ছিল আবার যেন আপনার সঙ্গে দেখা হয়। দেখা হয়েছে।'

'আমি কি আপনার নাম জানতে পারি?'

'জানতে পারেন। কিন্তু নাম জানার দরকার আছে কি? আমি আপনার নাম জানি না। আপনিও আমারটা জানেন না। আমরা না হয় আমাদের নাম নাই জানলাম। রাত অনেক হয়ে গেছে। আপনারা রওনা হয়ে যান।'

আমি ব্যাঙাচিকে নিয়ে শালবনে ঢুকলাম। দু'জনে এগুচ্ছি — ক্রমেই ঘন বনে ঢুকে যাচ্ছি। ব্যাঙাচিকে বললাম, 'কি রে ভয় লাগছে?'

ব্যাঙাচি বলল, 'একটু লাগছে।'

'ক্ষিধে লাগছে?'

হুঁ'

'আজ তুই জোছনা খেয়ে পেট ভরাবি।'

'জোছনা কি করে খাব?'

'ভাত মাছ যেভাবে খায় সেভাবে খাবি। হা করবি, মুখে চাঁদের আলো পড়বে। সেই আলো কোঁৎ করে গিলে ফেলবি। তারপর দেখবি আর কোনদিন কিছু খেতে ইচ্ছা করবে না। তোর ক্ষিধে রোগ সেরে যাবে।'

'সত্যি?'

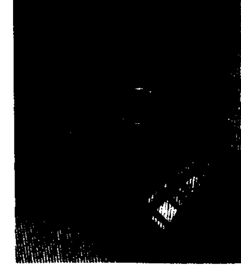
'হ্যাঁ সত্যি।'

বনভূমিতে মোটামুটি একটা ফাঁকা জায়গা পাওয়া গেল। জায়গাটা চাঁদের আলোয় ভরে গেছে। আমি আমার দীর্ঘ জীবনে এমন আলো দেখিনি। ব্যাঙাচির দিকে তাকালাম। সে চাঁদের দিকে হা করে তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণ পর পর মুখ

বন্ধ করে জোছনা খাবার ভঙ্গি করছে। ব্যাঙাচি এক ধরনের খেলা খেলছে কিন্তু সে জানে না এই খেলা তার রক্তে ঢুকে যাচ্ছে। বাকি জীবনে সে আর এই খেলা থেকে মুক্ত হতে পারবে না।

ব্যাঙাচি হঠাৎ অবাক গলায় বলল, 'হিমু। কি ব্যাপার বল তো? আমি চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছি হঠাৎ দেখি ধপ করে চাঁদটা অনেকখানি নিচে নেমে এসেছে। হচ্ছেটা কি?'

আমি কিছু বললাম না। শুধু যে চাঁদ নিচে নেমে আসছে তানা। আমরা যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছি সেটাও বড় হতে শুরু করেছে। একসময় তা বিশাল এক খোলা প্রান্তর হয়ে যাবে। সেখানে থৈ থৈ করবে অবাক জোছনা। চাঁদ নেমে আসবে হাতের কাছে। হাত বাড়ালেই চাঁদ স্পর্শ করা যাবে। আমি অপেক্ষা করে আছি।



জন্ম ঃ ১৩ই নভেম্বর ১৯৪৮ ইংরেজী।
জন্মস্থান ঃ নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জে, তাঁর মাতুলালয়ে।
বাবা ঃ ফয়জুর রহমান আহমেদ, মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদ সৈনিক।
মা ঃ আয়শা আখতার।
হুমায়ূন আহমেদ একসময় শিক্ষকতা করতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। পড়াতে আর ভালো লাগে না বলে চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর তিন কন্যা, নোভা-শীলা-বিপাশা, এক পুত্র নুহাশ। স্ত্রী গুলতেকিন খান। অবসরে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বন্ধুদের নিয়ে খুব হৈচৈ করেন, এবং বলেন, *জনতার মধ্যেই আছে নির্জনতা। আমার অনেক অনুসন্ধানের একটি অনুসন্ধান হল নির্জনতার অনুসন্ধান।*